মৌরীফুল

মৌরীফুল

অন্ধকার তখনও ঠিক হয় নাই। মুখুয্যে-বাড়ির পিছনে বাঁশবাগানে জোনাকীর দল সাঁজ জ্বালিবার উপক্রম করিতেছিল। তাল-পুকুরের পাড়ে গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে—মাঠের ধারে বাঁশবাগানের পিছনটা সূর্যাস্তের শেষ-আলোয় উজ্জ্বল। চারিদিক বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মুখুয্যেদের অন্দর-বাড়ি হইতে এক তুমুল কলরব আর হইচই উঠিল।

বৃদ্ধ রামতনু মুখুয্যে শিবকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। তিনি রোজ সন্ধ্যাবেলায় আহুতি দিয়া থাকেন, এজন্য প্রায় একপোয়া খাঁটি গাওয়া ঘি তাঁর চাই। তিনি নানা উপায়ে এই ঘি সংগ্রহ করিয়া ঘরে রাখিয়া দেন। অন্যদিনের মত আজও তাকের উপর একটা বাটিতে ঘি-টা ছিল, তাঁর পুত্রবধূ শশীলা সেই বাটি তাকের উপর হইতে পাড়িয়া সে ঘি-টার সমস্তই দিয়া খাবার তৈয়ারী করিয়াছে।

রামতনু মুখুয্যে মহকুমার কোর্টে গিয়াছিলেন, ও-পাড়ার চৌধুরীদের পক্ষে একটা মকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে।

বিপক্ষের উকীল তাঁকে জেরার মুখে জিজ্ঞাসা করেন—আপনি গত মে মাসে পাঁচু রায় আর তার ভাইয়ের পাঁচিলের জায়গা নিয়ে মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিলেন না?

রামতনু মুখুয্যে বলিয়াছিলেন—হাঁ তিনি ছিলেন।

উকীল পুনরায় জেরা করিয়াছিলেন—দু-নালির চৌধুরীদের কান-সোনার মাঠের দাঙ্গার মকদ্দমায় আপনি পুলিশের দিকে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন কি না?

রামতনু মহাশয়কে ঢোঁক গিলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে তিনি দিয়াছিলেন বটে।

বিপক্ষের উকীল আবার প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, এর কিছুদিন পরেই বড়-তরফের স্বত্বের মামলায় আপনি বাদী-পক্ষের সাক্ষী ছিলেন কি না?

কবে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, মুখুয্যে মহাশয় প্রথমটা তাহা মনে করিতে পারেন নাই, তারপর বিপক্ষের উকীলের পুনঃ পুনঃ কড়া প্রশ্নে এবং মুন্সেফবাবুর ভ্রূকুটি-মিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখে হতভাগ্য রামতনুর মনে পড়িয়াছিল যে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন বটে এবং এই গত জুলাই মাসে এই কোর্টেই তাহা তিনি দিয়া গিয়াছেন।

তারপর কোর্টে কি ঘটিয়াছিল, বিপক্ষের উকীল হাকিমের দিকে চাহিয়া রামতনুর উপর কি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, রামতনু উকীল-আমলায় ভর্তি মুন্সেফ-বাবুর এজলাসে হঠাৎ কিরূপে সপুষ্প সর্ষপক্ষেত্রের আবিষ্কার করেন, সে-সকল কথা উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। তবে মোটের উপর বলা যায়, রামতনু মুখুয্যে যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তাঁর শরীরের ও মনের অবস্থা খুবই খারাপ। কোথায় এ অবস্থায় তিনি ভাবিয়াছিলেন হাত পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া শ্রীগুরুর উদ্দেশে আহুতি দিয়া অনিত্য বিষয়-বিষে জর্জরিত মনকে একটু

স্থির করিবেন, না দেখেন যে আহুতির জন্ত আলাদা করিয়া তোলা যে ঘি-টুকু তাকে ছিল, তাহার সবটাই একেবারে নষ্ট হইয়াছে।

তারপর প্রায় অর্ধ-ঘণ্টা ধরিয়া মুখুয্যে বাড়ির অন্দর মহলে একটা রীতিমত কবির লড়াই চলিতে লাগিল। মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্রবধূ সুশীলা প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইলেও সামলাইয়া লইয়া এমন-সব কথায় শ্বশুরকে জবাব দিতে লাগিল যাহা একজন আঠারো-বৎসর-বয়স্কা তরুণীর মুখে সাজে না। পক্ষান্তরে কোর্টে বিপক্ষের উকীলের অপমানে ও ঘরে আসিয়া পুত্রবধূর নিকট অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় রামতনু মুখুয্যে পুত্রবধূর পিতৃকুল ও তাঁহার নিজের পিতৃ-কুলের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এমন-সব দুরূহ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভূবালের গল্পে উল্লিখিত কুলাদর্শ-বিদ্যা অধ্যয়ন না করিলে সে-সব বুঝা একেবারেই অসম্ভব।

এমন সময় মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলে কিশোরী বাড়ী আসিল। তাহার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইবে, বেশী লেখা-পড়া না শেখায় সে চৌধুরীদের জমিদারী কাছারীতে ন'টাকা বেতনে মুহুরীগিরি করিত।

কিশোরীলাল নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে আলো দেওয়া হয় নাই, অন্ধকারেই জামা কাপড় ছাড়িয়া সে বাহিরে হাত-পা ধুইতে গেল। তারপর ঘরে ঢুকিয়া শুনিল, ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরে সুশীলা তাহার সম্মুখের বাতাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে, এ সংসারে থাকিয়া সংসার করা তাহার শক্তিতে কুলাইবে না, অতএব কাল সকালেই যেন গরুর গাড়ি ডাকাইয়া তাহাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কিশোরী সে কথার কোন বিশেষ জবাব না দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া, বাঁশের লাঠিগাছা ঘরের কোণ হইতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ও-পাড়ায় রায়-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের নিষ্কর্মা যুবক-দিগের যাত্রার আখড়াই ও রিহার্সেল চলিত—সেইখানে অনেকক্ষণ কাটাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আসা তাহার নিত্যকর্মের ভিতর।

রামতনু মুখুয্যে মহাশয়ও অনেকক্ষণ বাহিরের ঘরে কাটাইলেন। প্রতিবেশী হরি রায় তামাকের খরচ বাঁচাইবার জন্ত সকাল-সন্ধ্যায় মুখুয্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রয় করিতেন; তাঁহাকে রামতনু জানাইলেন যে তিনি খুব শীঘ্রই কাশী যাইতেছেন, কারণ আর এ-বয়সে —, ইত্যাদি।…

তাঁহার এ বানপ্রস্থ অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষার জন্ত দায়ী একমাত্র তাঁহার পুত্রবধূ সুশীলা। সুশীলা সকাল নাই সন্ধ্যা নাই একটা কিছু না বাধাইয়া থাকিতে পারে না। সে অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে যাইলে ক্ষেপিয়া যায়। তাহার জন্ত রামতনু মুখুয্যের বাড়িতে কাক চিল বসিবার উপায় নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে হঠাৎ ঝাঁটিয়া উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু এজন্ত তাহার চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় না।

অনেক রাত্রে কিশোরী বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ঘরে খাবার ঢাকা আছে এবং স্ত্রী ঘুমাইতেছে। খাবারের ঢাকা খুলিয়া আহারাদি শেষ করিয়া সে শুইতে গিয়া দেখিল,

স্ত্রী ঘুম-জড়ানো চক্ষে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। স্বামীকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভের সুরে বলিল—কখন এলে? তা আমায় একটু ডাকলে না কেন?

কিশোরী বলিল—আর ডেকে কি হবে? আমার কি আর হাত পা নেই! নিতে জানি নে?

হঠাৎ তাহার স্ত্রী রাগিয়া উঠিল—নিতে জান তো জেনো। কাল থেকে আমার এখানে আর বনবে না। এ যেন হয়েচে শত্রুপুরীর মধ্যে বাস—বাড়িসুদ্ধ লোক আমার পেছনে এমন করে লেগেছে কে, শুনতে চাই। না হয় বরং…

কান্নায় ফুলিয়া সে বালিসের উপর মুখ গুঁজিল।

কিশোরী দেখিল স্ত্রী রাত-দুপুরের সময় গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিয়া একটা বিভ্রাট বাধাইয়া তোলে বুঝি। এরকম করিয়া আর সংসার করা চলে না—ভাত ঢাকা ছিল, খুলিয়া লইয়া খাইয়াছে, ইহাতেও যদি স্ত্রী চটিয়া যায় তাহা হইলে আর পারা যায় না; কিছু না, ও একটা ছল; ঐ সামান্য সূত্র ধরিয়া এখনি সে একটা রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিবে।

কিশোরী বলিল—যা খুশী কালকে কোরো—এখন একটু ঘুমুতে দাও। ঘুমুচ্ছিলে বলেই আর ডাকিনি এই তো অপরাধ? তা বেশ, কাল থেকে ওঠাবো, চুলের নড়া ধরে ওঠাবো।

সুশীলা কথাও বলিল না, মুখও তুলিল না, বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া রামতনু মুখুয্যে শুনিলেন, চৌধুরীরা খবর পাঠাইয়াছে কয়েকটি নূতন সাক্ষীর তালিম দিতে হইবে। যাইবার সময় তিনি বলিলেন—ও বউমা, একটু সকাল সকাল ভাত দিয়ো, কোর্টে যেতে হবে।

বেলা নয়টার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—সুশীলা স্নান করিয়া আসিয়া রৌদ্রে কাপড় মেলিয়া দিতেছে, গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরী রান্নাঘরে বসিয়া রাঁধিতেছেন। স্বামীকে দেখিয়াই মোক্ষদা চৌকিদার হাঁকার সুরে বলিতে লাগিলেন—হয় আমি একদিকে বেরিয়ে যাই, না হয় বাপু এর একটা বিহিত করো। সেই সকাল থেকে ঘুরপাক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, বলছি—ও বউমা, দুটো ভাত চড়িয়ে দাও, ওগো যা হয় দুটো-কিছু রাঁধ—হাতে পায়ে ধরতে কেবল বাকী রেখেছি। কার কথা কে শোনে?—এই বেলা-দুপুরের সময় রানী এখন এলেন নেয়ে…

সুশীলা রক হইতেই সমান গলায় উত্তর দিল—মাইনে করা দাসী তো নই, আমি যখন পারব রান্না চড়াবো—সকাল থেকে বসে আছি নাকি? এত খাটুনি সেরে আবার আটটার মধ্যে ভাত দেবো—মানুষের তো আর শরীর নয়—যার না চলবে সে নিজে গিয়ে রেঁধে নিক…

এ-কথার উত্তরে মোক্ষদা খুন্তী হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া নটরাজ শিবের তাণ্ডব নর্তনের একটা আধুনিক সংস্করণ শুরু করিতে যাইতেছিলেন—একটা ঘটনায় তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

একটা দশ-বারো বৎসরের ছেলে, রংটা বড়ই কালো, ম্যালেরিয়ায় শরীর জীর্ণ শীর্ণ, পরনে

অতি ময়লা এক গামছা, শীতের দিনেও তাহার গায়ে কিছু নাই, হাতে ছোট একটা বাখারির ছড়ি লইয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। ছেলেটি পাশের গ্রামের আতর আলি ঘরামীর ছেলে, গত-বৎসর তার বাপ মারা গিয়াছে, দুটি ছোট ছোট বোন আর মা ছাড়া তার আর কেহ নাই। অবস্থা খুব খারাপ, সবদিন খাওয়া জোটে না, ছেলেটা পিঠে ছড়ি বাজাইয়া হাপু গাহিয়া মা ও বোন দুটিকে প্রতিপালন করে। সে এ-গ্রামের প্রায় সব বাড়িতে আসিত, কিন্তু মুখুয্যে-বাড়ি আর কখনো আসে নাই তাহার একটা কারণ এই যে, দানশীলতার জন্য রামতনু মুখুয্যে গ্রামের মধ্যে আদৌ প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

ছেলেটি উঠানে দাঁড়াইয়া বগল বাজাইয়া নানারূপ সুর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাপু গাহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে জোর করিয়া লাঠির বাড়ি মারিতে লাগিল।

তিনটি নেহাত গো-বেচারী সাক্ষীর তালিম দিতে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রামতনুর মেজাজ ভাল ছিল না, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—থাম্—থাম্, ও-সব রাখ্—এখন ও-সব দেখবার শখ্ নেই—যা অন্য বাড়ি দেখ্‌গে যা—যা···

সুশীলা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে অবাক্ হইয়া হাপু গাওয়া দেখিতেছিল—ছেলেটি সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে যাইতেই সে তাড়াতাড়ি বাহিরের রকে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল—শোন, তোর বাড়ি কোথায় রে?

—হরিশপুর মা-ঠাকরুণ।

—তোর বাড়িতে কে আছে আর?

—মোর বাপ মারা গিয়েছে আর-বছর মা-ঠাকরুণ—মোদের আর কেউ নাই, মুই বড়, ছোট দুটো বোন আছে···

—তাই বুঝি তুই হাপু গাস? হ্যাঁ রে, এতে চলে?

রামতনুর ধমক খাইয়া ছেলেমানুষ অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল, সুশীলার কথার ভিতর সহানুভূতির সুর চিনিয়া লইয়া হঠাৎ তাহার কান্না আসিল—চোখের জল হু হু করিয়া পড়িতেই ম্যালেরিয়া-শীর্ণ হাতটি তুলিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—না মা-ঠাকরুণ, চলে না। এ-সব লোকে আর দেখতে চায় না। মুই যদি ভাল গান গাইতি পারতাম তো যাত্রার দলে যাতাম, বড় কষ্ট মোদের সংসারের—এই শীতি মা-ঠাকরুণ···

সুশীলা বাধা দিয়া বলিল—দাঁড়া, আমি আসছি।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কান্নার বেগ অতিকষ্টে সামলাইয়া চাহিয়া দেখিল আলনায় একখানা নূতন মোটা বিছানার চাদর ঝুলিতেছে, হাতের গোড়ায় সেইখানা পাইয়া টানিয়া লইল। তারপর জানালা দিয়া বাড়ির মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া চাদরখানা তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে দিয়া চুপি চুপি বলিল—এইখানা নিয়ে যা, এতে শীত বেশ কাটবে। কাটবে না? খুব মোটা। শীগ্‌গির যা, লুকিয়ে নিয়ে যা, কেউ যেন না দেখে···

ছেলেটা চাদর হাতে হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সুশীলা বলিল—ওরে এক্ষুনি কে এসে পড়বে, শীগ্‌গির যা···

ছেলেটাকে বিদায় দিয়া সুশীলা ভিতর-বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিল শ্বশুর আহার করিতে বসিয়াছেন। ছেলেটার দুঃখে সুশীলার মন খুব নরম হইয়া গিয়াছিল সে গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাজে মন দিল, শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে কিছু দেব বাবা ?

মোক্ষদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—তোমাকে আর কিছু দিতে হবে না, যে মিষ্টি বচন দিয়েছ তাতেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, নাও এখন পার তো এদিকে এস একবার, হাঁড়িটা দেখ, নয় তো বল নিজে মরি-বাঁচি একরকম করে' সাঙ্গ করে' তুলি।

রামতনু কোন কথা বলিলেন না, আপন মনে খাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এই-সব ব্যাপারেই সুশীলা অভ্যস্ত চটিয়া যাইত, রামতনু পুত্রবধূর নিকট কোন জিনিস চাহিয়া খাইলে তাহার রাগ গলিয়া জল হইয়া যাইত, কিন্তু লোকে তাহাকে জব্দ করিতেছে বা অপমান করিবার ফন্দী খুঁজিতেছে ভাবিলে তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না, সেও কোমর বাঁধিয়া রণে আগুয়ান হইত। সেই বা ছাড়িবে কেন ?

মাস-দুই পরে।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু বেশ গরম পড়িয়াছে। কিশোরী অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিয়াছে। বাড়িতে যে যাহার ঘরে ঘুমাইতেছে। সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সুশীলা ঘরের মেজেয় বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছে। কিশোরী সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে।

সুশীলা চিঠির কাগজখানা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চাপিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া একটু দুষ্টামির হাসি হাসিল, বলিল—বলবো কেন ?

—থাক, না বলো, ভাত দাও। রাত কম হয় নি। আবার সকাল থেকেই খাটুনি আরম্ভ হবে।

সুশীলা ভাবিয়াছিল স্বামী আসিয়া সে কি লিখিতেছে দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিবে। প্রকৃতপক্ষে সে চিঠি কাহাকেও লিখিতেছে না, স্বামীকে কথা বলাইবার এ তার একটা পুরানো কৌশল মাত্র। অনেক দিন সে স্বামীর মুখে দুটো ভাল কথা শুনে নাই, তাহার নারী-হৃদয় ইহারই জন্য তৃষিত ছিল এবং ইহারই জন্য সে ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতেও এই সামান্য ফাঁদটি পাতিয়া বসিয়া ছিল—কিন্তু কিশোরী ফাঁদে পা দেওয়া দূরে থাকুক, সেদিকে ঘেঁষিলও না দেখিয়া সুশীলা বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কাগজ কলম তুলিয়া রাখিয়া সে স্বামীর ভাত বাড়িয়া দিল। একপ্রকার চুপচাপ অবস্থায় আহারাদি শেষ করিয়া কিশোরী গিয়া শয্যা আশ্রয় করিবার পর, সে নিজে আহারাদি করিয়া শুইতে গিয়া দেখিল কিশোরী ঘুমায় নাই, গরমে এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। আশায় বুক বাঁধিয়া সে তাহার দ্বিতীয় ফাঁদটি পাতিল।

—একটা গল্প বলো না ? অনেকদিন তো বলনি, বলবে লক্ষ্মীটি···

বিবাহের পর প্রথম প্রথম কিশোরী তাহার কিশোরী স্ত্রীর নিকট বটতলার আরব্য

উপন্যাস হইতে নানা গল্প বলিত। রাত্রির পর রাত্রি তখন এ-সব গল্প শুনিয়া সুশীলা মুগ্ধ হইয়া যাইত। জনহীন দেশের মধ্যে যেখানে শুধু জীন-পরীদের জগৎ···খেজুর বনের মধ্যে ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা হইতে মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে···পথহীন দুরন্ত মরুপ্রান্তরে মৃত্যু যেখানে শিকার সন্ধানে ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, সমুদ্রের ঝড়···তরুণ শাহ্‌জাদাগণের দৈত্যসঙ্কুল অরণ্যের মাঝখান দিয়া নির্ভীক শিকারযাত্রা—এ-সব শুনিতে শুনিতে তাহার গা শিহরিয়া উঠিত, ঘুম ভাঙিলে ঘরের মধ্যে অর্ধরাত্রির অন্ধকার বিকটাকার জীনদেহের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিত। প্রাচীন যুগের তরুণ শাহ্‌জাদাদের কল্পনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে সে নিজের স্বামীকে যাত্রার দলের রাজার পোশাক পরাইয়া দূরদেশে বিপদের মুখে পাঠাইত, শাহ্‌জাদাদিগের দুঃখে তাহার নিজের স্বামীর উপর সহানুভূতিতেই তাহার চোখে জল আসিত। এই রকমে গল্প শুনিতে শুনিতে অদৃশ্য নায়ক-নায়িকাদের গুণ দৃশ্যমান গল্পকারের উপরে প্রয়োগ করিয়া যে স্বামীকে প্রথম ভালবাসে। সে আজ পাঁচ ছয় বৎসরের কথা, কিন্তু সুশীলার এখনও সে ঘোর কাটে নাই।

কিশোরী স্ত্রীর কথা উড়াইয়া দিল—হ্যাঁ, এখন গল্প বলবো! সমস্ত দিন খেটেখুটে এলাম, এখন রাত-দুপুরে বকবক করি আর কি। তোমাদের কি? বাড়ি বসে' সব পোষায়।

অন্য মেয়ে হইলে চুপ করিয়া যাইত। সুশীলার মেজাজ ছিল একগুঁয়ে। সে আবার বলিল, তা হোক, একটা বলো, রাত এখন তো বেশী নয়···

—না বেশী নয়—তোমার তো রাত কম বেশীর জ্ঞান কত! নাও, চুপচাপ শুয়ে পড় এখন·····

সুশীলা এইবার জিদ ধরিল—বলো না একটা, ছোট দেখেই না হয় বলো—এত করে বলছি একটা কথা রাখতে পারো না?

কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ! এ তো বড় জ্বালা হ'ল! রাতেও একটু ঘুমুবার যো নেই—সমস্তদিন তো গলাবাজিতে বাড়ি সরগরম রাখবে, রাত্তিরটাও একটু শান্তি নেই?

এইটাই ছিল সুশীলার ব্যথার স্থান। স্বামীর মুখে একথা শুনিয়া সে ক্ষেপিয়া গেল—বেশ করি গলাবাজি করি, তাতে অসুবিধা হয় আমাকে পাঠিয়ে দাও এখান থেকে—রাত দুপুর করলে কে! নিজে আসবেন রাত দুপুরের সময় আড্ডা দিয়ে—কে এত রাত পর্যন্ত ভাত নিয়ে ব'সে থাকে? নিজেরই দেহ, পরের আর তো দেহ না! খেটেখুটে এসে একেবারে রাজা করেছেন আর কি? নিজের খাটুনিটাই কেবল·····

কিশোরী ঘুমাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, স্ত্রীর উত্তরোত্তর চড়া সুরে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল—উঠিয়া বসিয়া প্রথমে সে স্ত্রীর পিঠে সজোরে ঘা-কতক পাখার বাঁট বসাইল, তাহার পর তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বিছানার উপর হইতে নামাইয়া ধাক্কা মারিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল, বলিল—বেরো, ঘর থেকে বেরো, আপদ—দূর হ—রাত দুপুরেও একটু শান্তি নেই—যা যেয়ো—যেখানে খুশি যা·····

ঘরের আলোর কাছে আসিয়া কিশোরী দেখিল স্ত্রী দুই হাতের নখ দিয়া আঁচড়াইয়া

তাহার হাতের আঙুলগুলিতে রাক্তপাত করিয়া দিয়াছে।

ইরাণী শাহ্জাদাগণের নজীর না থাকিলেও কিশোরী মধ্যে মধ্যে দুরন্ত স্ত্রীর প্রতি এরূপ ঔষধি প্রয়োগ করিত।

শেষ-রাত্রে একাদশীর জ্যোৎস্নায় চারিদিক যখন ফুলের পাপড়ির মত সাদা, ভোর রাত্রের বাতাস নেবু-ফুলের গন্ধে আর পাপিয়ার গানে মাখামাখি, সুশীলা তখন ঘরের দোরের বাহিরে আঁচল পাতিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল।

সকাল হইলে যে-যার কাজে মন দিল। মোক্ষদা বলিলেন—বউমা, আজ চৌধুরীরা শিবতলায় পূজো দিতে যাবে, আমাদের যেতে বলেছে, সকাল-সকাল সেরে নাও।

এই চৌধুরীটি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রামতনু মুখুয্যের প্রতিপালক, ইঁহারাই গ্রামের জমিদার এবং ইঁহাদেরই জমি-জমা সংক্রান্ত মকদ্দমার তদ্বির ও সাহায্য করিয়া রামতনু অন্নসংস্থান করিতেন।

বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া ভাল কাপড় পরিয়া সকলে নৌকায় উঠিল—দুই ঘণ্টার পথ। চৌধুরী-বাড়িতে কলিকাতা হইতে একটি বউ আসিয়াছিল। তাহার স্বামী বড়লোকের ছেলে, এম-এ পাস করিয়া বছর-দুই হইল ডেপুটিগিরি চাকরি পাইয়াছে। বউটি কলিকাতার মেয়ে, চৌধুরীদের সহিত তাহার স্বামীর কিরূপ সম্পর্ক আছে, এজন্য চৌধুরীগৃহিণী রাসপূর্ণিমার সময় তাহাকে আনাইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে সে কখনো পাড়াগাঁয়ে আসে নাই। নৌকায় খানিকটা বসিয়া থাকিবার পর বউটি দেখিল, নীলাম্বরী কাপড় পরনে তাহারই সমবয়সী আর-একটি বউ নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল, নৌকায় সমবয়সী সঙ্গিনী পাইয়া কলিকাতার বউটি খুব সন্তুষ্ট হইলেও প্রথমে আলাপ করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। সঙ্গিনীর কাপড়-চোপড় পরিবার অগোছাল ধরন দেখিয়া বউটি বুঝিয়াছিল তাহার সঙ্গিনী নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অবস্থাও খুব ভাল নয়। নৌকার ও-ধারে চৌধুরীগৃহিণী মোক্ষদার সহিত সাবিত্রী-ব্রত প্রতিষ্ঠার কি আয়োজন করিয়াছেন, তাহারই বিস্তৃত বড়মানুষী ফর্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন। নৌকায় কোন পরিচিতা মেয়েও নাই, কাজেই বউটি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বউটি লেখাপড়া জানিত এবং দেশ-বিদেশের খবরাখবরও কিছু কিছু রাখিত—চৌধুরীগৃহিণীর একঘেয়ে বড়মানুষী চালের কথাবার্তায় সে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর, সে লক্ষ্য করিল তাহার সঙ্গিনী ঘোমটার ভিতর হইতে কালো-কালো ডাগর চোখে তাহার দিকে সকৌতুকে চাহিতেছে। বউটির হাসি পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি ভাই?

সুশীলা সন্দিগ্ধস্বরে বলিল—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী।

সুশীলার রকম-সকম দেখিয়া বউটির খুব হাসি পাইতে লাগিল। সে বলিল—অত ঘোমটা কিসের ভাই? তুমি আর আমি ছাড়া তো আর কেউ এদিকে নেই, নাও এস, ঘোমটা খোল, একটু গল্প করি।

এই কথা বলিয়া বউটি নিজেই সুশীলার ঘোমটা খুলিয়া দিল—সুশীলার সুন্দর মুখের দিকে

চাহিয়া সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল ; রং যদিও তত্তটা ফরসা নয়, কিন্তু কালোর উপর অত শ্রী সে কখনো দেখে নাই, নদীর ধারের সরস সতেজ চিক্কণ শ্যাম-কলমী-লতারই মত একটা সবুজ লাবণ্য যেন সারা মুখখানার মাখানো। মুখখানি দেখিয়াই সে এই নিরাভরণা পাড়াগাঁয়ের মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিল—উনি বসে আছেন কে ভাই, শাশুড়ী ?

—হ্যাঁ।

—এস, আর একটু সরে এস ভাই, দুজনে গল্প করি আর দেখতে দেখতে যাই। তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ভাই ?

সুশীলার ভয় কাটিয়া যাইতেছিল, সে বলিল—সে হ'ল শিমলে।

—কোন্ শিমলে ? কলকাতা শিমলে ?

কলকাতায় শিমলে আছে নাকি ? কৈ তাহা তো সুশীলা কোনদিন শোনে নাই সে বলিল—আমার বাপের বাড়ি এখান থেকে বেশী দূর নয়, পাঁচ ছ' কোশ পথ, গরুর গাড়ি করে যেতে হয়।

নদীর ধারে যবক্ষেত, সর্ষেক্ষেত, বুনো গাছপালা দেখিয়া বউটি খুব খুশি। এ-সব সে পূর্বে বড় দেখে নাই, আঙুল দিয়া একটা মাছরাঙা পাখী দেখাইয়া বলিল—বাঃ, বড় সুন্দর তো! ওটা কি পাখী ভাই ?

—ওটা তো মাছরাঙা পাখী, কেন তুমি দেখনি কখনো ?

বউটি বলিল—ভাই, আমি কলকাতার বাইরে অ্যাদ্দিন পা দিইনি, খুব ছেলেবেলা একবার বাবার সঙ্গে চন্দননগরে বাগানবাড়িতে যাবার কথা মনে আছে, তারপর এই আসছি—তুমি আমায় একটু দেখিয়ে নিয়ে চল। ওটা কিসের ক্ষেত ভাই ?

সুশীলা দেখিল তাহার সঙ্গিনী আঙুল দিয়া নদীর ধারের একটা মৌরীর ক্ষেত দেখাইতেছে —প্রথমটা সে সঙ্গিনীর চোখ-ঝল্‌সানো রং, অদৃষ্টপূর্ব দামী সিল্কের শাড়ি, ব্লাউজ এবং চিক্‌চিকে নেক্‌লেসের বাহার দেখিয়া যে ভয় অনুভব করিতেছিল, তাহার অজ্ঞতা দেখিয়া সুশীলার সে ভয় কাটিয়া অজ্ঞ-সঙ্গিনীর উপর একটু স্নেহ আসিল—কলিকাতায় মাছরাঙা পাখী, মৌরীক্ষেত, এ-সব সামান্য জিনিসও নাই নাকি ? সুশীলা হাসিয়া বলিল—তুমি ফুলের গন্ধ দেখে বুঝতে পার না ভাই ? ও তো মৌরীর ক্ষেত। কেন, আমাদের বাপের বাড়ির গাঁয়ে কত তো মৌরীর ক্ষেত আছে—মৌরীর শাক কখনো খাও নি ? কল্‌কাতায় বুঝি নেই ?

কলিকাতার বউটি বুঝাইয়া দিল যে কলিকাতার অতীত ইতিহাসের সে খবর রাখে না, বর্তমান অবস্থায় সেখানে মৌরীক্ষেত প্রভৃতি থাকা সম্ভবপর নয়, তবে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন নৌকা শিবতলার ঘাটে গিয়া লাগিল, তখন তাহাদের দুজনের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের কথাবার্তা হইয়া গিয়াছে। সঙ্গিনীর মুখে স্বামীর আদরের গল্প শুনিয়া সুশীলার মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা জাগিয়া উঠিল—সেটা সে অনবরত চাপিবার চেষ্টা করে, তবু কি জানি কেন সেটা ফাঁক পাইলেই মাথা তোলে। প্রথম বিবাহের পর

তাহার স্বামীও তো তাহাকে কত আদর করিত, রাত্রে ঘুমাইতে না দিয়া নানা গল্পে ভুলাইয়া জাগাইয়া রাখিত, সুশীলা পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত সাধ্যসাধনা করিয়া পান মুখে তুলিয়া দিত—সেই স্বামী তাহার কেন এমন হইল? তাহার বুকটার মধ্যে কেমন হু হু করিয়া উঠিল।

দুজনে তাহারা খানিকক্ষণ গাছের ছায়ায় নদীর ধারে এদিক ওদিক বেড়াইল, কি সুন্দর দেখায় চারিদিক!···নীল আকাশ সবুজ মাঠের উপর কেমন উপুড় হইয়া আছে!···ওমা, পানকৌড়ির ঝাঁক চরের উপর বসিয়া বসিয়া কেমন ঝিমায়!···

কলিকাতার বউটি বলিল—এস ভাই, আমরা একটা কিছু পাতাই। কেমন?

সুশীলা খুশি হইয়া বলিল—খুব ভাল ভাই, কি পাতাব বলো...

—এক কাজ করি এস—আসতে আসতে নদীর ধারে যে মৌরীফুল দেখে এলাম, এস আমরা দুজনে পাতাই। কেমন?

সুশীলা আহ্লাদের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। নদী হইতে অঞ্জলি করিয়া জল তুলিয়া তাহারা মৌরীফুল পাতাইল।

এমন সময় মোক্ষদা ডাকিলেন—বউমারা এদিকে এস।

তাহারা গিয়া দেখিল গাছতলায় অনেক লোক—সেদিন পূজা দিতে অনেক লোক আসিয়াছিল। প্রকাণ্ড বটগাছ, তাহার তলায় ভাঙা ইঁটের মন্দির। গাছতলা হইতে একটু দূরে এক বুড়ী নানা ঔষধ বিক্রয় করিতেছে। সুশীলা ও তাহার সঙ্গিনী সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, রোগ সারা, ছেলে হওয়া হইতে শুরু করিয়া সকল রকমের ঔষধই আছে, গরু হারাইলে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর্যন্ত। মেয়েরা সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ঔষধ কিনিতেছে। সুশীলার সঙ্গিনী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে সেখান হইতে মন্দিরের দিকে লইয়া চলিল, বলিল—চলো মৌরীফুল, দেখিগে কেমন পুজো হচ্ছে।

একটুখানি মন্দিরে দাঁড়াইয়া সুশীলা একটা ছুতায় সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঔষধ-বেচা বুড়ীর নিকট দাঁড়াইল। সেখানে তখন কেহ ছিল না, বুড়ী বলিল—কি চাই।

সুশীলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

বুড়ী বলিল—আর বলতে হবে না মা-ঠাকরুণ। তা তোমার তো এখনও ছেলে-পিলে হবার বয়েস যায় নি, ও বয়েসে অনেকের···

সুশীলা সলজ্জভাবে বলিল—তা নয়।

বুড়ী বলিল—এবার বুঝলাম মা-ঠাকরুণ—তা যদি হয়, তা হ'লে তোমার সোয়ামীর বার-মুখো টান আছে। একটা ওষুধ দিই, নিয়ে যাও, একমাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে—ও-রকম সব ঠিক হয়ে যাবে—ও-রকম কত হয় মা-ঠাকরুণ···

বুড়ী একটা শিকড় তুলিয়া বলিল—এই নাও, বেটে খাইয়ে দিও। যেন কেউ টের না পায়, টের পেলে আর ফল হবে না। আট আনা লাগবে।

স্বামীর বার-মুখো টান আছে—একথা শুনিয়া সুশীলা খুব দমিয়া গেল। তাহার আঁচলে

একটা আধুলী বাঁধা ছিল, আজকার দিনে জিনিসটা-আসটা কিনিবার জন্যে সে ইহা বাড়ি হইতে শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিয়াছিল। বাড়ির বার হওয়া তো বড় ঘটে না, কাজেই এটা তাহার পক্ষে একটা উৎসবের দিন। আধুলীটি শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিবার কারণ—মোক্ষদা ঠাকরুণ জানিতে পারিলে ইহা এতক্ষণ তাহার আঁচলে থাকিত না। সুশীলা আঁচল হইতে আধুলীটি খুলিয়া বুড়ীকে দিল এবং খাওয়াইবার প্রণালী জানিয়া লইয়া শিকড়টি কাপড়ের মধ্যে গোপনে বাঁধিয়া লইল।

পূজা দেওয়া সাঙ্গ হইয়া গেল। সকলে আবার আসিয়া নৌকায় উঠিল। গ্রামের ঘাটের কাছাকাছি আসিলে সুশীলা বলিল—ভাই, তুমি এখন দিনকতক আছ তো?

—না ভাই, আমি কাল কি পরশু চলে যাব। তা হ'লেও তোমায় ভুলবো না মৌরীফুল, তোমার মুখখানি আমার মনে থাকবে ভাই—চিঠি-পত্র দেবে তো? এবার পাড়াগাঁয়ে এসে তোমায় কুড়িয়ে পেলাম—তোমায় কখনো ভুলবো না।

সুশীলার চোখে জল আসিল, এত মিষ্ট কথা তাহাকে কে বলে? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে দুষ্ট, একগুঁয়ে ঝগড়াটে।

তাহার হাতে একটি সোনার আংটি ছিল, ইহা তাহার মায়ের দেওয়া আংটি, বিবাহের পর প্রথম তাহার মা তাহার হাতে এটি পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেটি হাত হইতে খুলিয়া সে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিল—দেখি ভাই তোমার আঙুল, তুমি হ'লে মৌরীফুল, তোমায় খাওয়াবার কথা, কাপড় দেওয়ার কথা—এই আংটিটা আমার মায়ের দেওয়া, তোমায় দিলাম, তবু এটা দেখে তুমি গরীব মৌরীফুলকে ভুলে যাবে না।

সুশীলা আংটিটা সঙ্গিনীর হাতে পরাইয়া দিতে গেল,—বউটি চট করিয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিল—দূর পাগল! না ভাই এ রাখো—তোমার মায়ের দেওয়া আংটি—এ কেন আমায় দিতে যাবে? না ভাই···

সুশীলা জোর করিতে গেল—হোক ভাই, দেখি—মায়ের দেওয়া বলেই···

বউটি বলিল—দূর! না ভাই ও-সব রাখো—সে বরং ..

সুশীলা খুব হতাশ হইল। মুখটি তাহার অন্ধকার হইয়া গেল—সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিল। বউটি সুশীলার হাত ধরিয়া বলিল—পায়ে পড়ি ভাই মৌরীফুল, রাগ কোরো না। আচ্ছা, কেন তুমি শুধু শুধু তোমার মায়ের দেওয়া আংটি আমায় দিতে যাবে ভাই? আচ্ছা, তুমিই যদি দিতে চাও এই পূজোর সময় আসবো—অন্য কিছু বরং দিও—একদিন না হয় খাইয়ো—আংটি কেন দেবে ভাই!—আর আমায় ভুলবে না তো ভাই?

সুশীলা ব্যগ্রভাবে বলিল—তোমায় ভুলবো না ভাই মৌরীফুল! কখ্খোনো না—তুমি কোন্ জন্মে যে আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে ভাই মৌরীফুল ..

তাহার পরে সে একটু আনাড়ি ধরনে হাসিয়া উঠিল—হিঃ হিঃ হিঃ! কেমন সুন্দর কথাটি—মৌরীফুল—মৌরীফুল—মৌরীফুল—তুমি যে হ'লে গিয়ে আমার নদীর ধারের মৌরীফুল—তোমায় কি ভুলতে পারি?···

কথা শেষ না করিয়াই সে দুই হাতে সঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কালো চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল।

কলিকাতার বউ এই অদ্ভুত প্রকৃতির সঙ্গিনীর অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানা বার বার সস্নেহে চুম্বন করিল—তারপর দুজনেই চোখের জলে আপসাদৃষ্টি লইয়া দুজনের কাছে বিদায় লইল।...

দিন কতক কাটিয়া গেল। কিশোরী বাটী নাই, কি-একটা কাজে অন্য গ্রামে গিয়াছে, ফিরিতে দু'একদিন দেরী হইবে। মোক্ষদা সকালে উঠিয়া জমিদার-গৃহিণীর আহ্বানে তাঁহার সাবিত্রী-ব্রত-প্রতিষ্ঠার আয়োজনে সাহায্য করিতে চৌধুরী-বাড়ি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—বউমা আমার ফেরবার কোনো ঠিক নেই, রান্না-বান্না করে' রেখো, আমি আজ আর কিছু দেখতে পারব না, চৌধুরী-বাড়ির কাজ—কখন মেটে বলা যায় না।

একথা মোক্ষদার না বলিলেও চলিত। কারণ ভোরে উঠিয়া বাসন-মাজা, জল-তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া এ সংসারের সমস্ত কাজের ভারই ছিল সুশীলার উপর। এ সংসারে কিশোরীর বিবাহের পর কোনো দিন ঝি-চাকর প্রবেশ করে নাই—যদিও পূর্বে বাড়িতে বরাবরই একজন করিয়া ঝি থাকিত। সুশীলার খাটুনিতে কোন ক্লান্তি ছিল না, খাটিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট ছিল—যখন মেজাজ ভাল থাকিত, তখন সমস্ত দিন নীরবে ভূতের মত খাটিয়াও সে বিরক্ত হইত না।

শাশুড়ী চলিয়া গেলে অন্যান্য কাজকর্ম সারিয়া সুশীলা রান্নাঘরে গিয়া দেখিল একখানিও কাঠ নাই। কাঠ অনেক দিনই ফুরাইয়া গিয়াছে, এ-কথা সুশীলা বহুবার শ্বশুরকে জানাইয়াছে। রামতনু মধ্যে মধ্যে মজুর ডাকাইয়া কাঠ কাটাইয়া লইতেন, এবার কিন্তু অনেক দিন হইল তিনি আর এদিকে দৃষ্টি দেন নাই, কিশোরীর দোষ নাই, কেন না সে বড় একটা বাড়িতে থাকিত না, সংসারের সংবাদ তেমন রাখিতও না। আসল কথা হইতেছে এই যে রান্নাঘরের পিছনে খিড়কির বাহিরে অনেক শুকনা বাঁশ ও ডালপালা পড়িয়া আছে—সুশীলা রান্না চড়ানোর পূর্বে বা রান্না করিতে করিতে প্রয়োজন মত এগুলি দা দিয়া কাটিয়া লইয়া কাজ চালাইত। রামতনু দেখিলেন, কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন কেন অনর্থক কাঠ কাটিবার লোক ডাকিয়া আনা—আনিলেই এখনই একটা টাকা খরচ তো? পুত্রবধূ বকিতেছে বকুক, কারণ বকুনিই উহার স্বভাব।

কাঠ নাই দেখিয়া সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া গেল। এদিকে বাড়িতেও এমন কেহ নাই যাহাকে বকিয়া গায়ের ঝাল মিটায়, কাজেই সে আপন মনে চীৎকার করিতে লাগিল—পারবো না, রোজ রোজ এমন করে' সংসার করা আমার দিয়ে হয়ে উঠবে না—আজ দু'মাস ধরে' বলছি কাঠ নেই, কাঠ নেই—এদিকে রান্নার বেলা ঠিক আছেন সব, তার একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই—কি দিয়ে রাঁধবে? হাত পা উনুনের মধ্যে দিয়ে রাঁধবে নাকি? রোজ রোজ কাঠ কাটো, কেটে রাঁধো—অত সুখে আর কাজ নেই—থাক্‌লো হাঁড়ি পড়ে', যিনি যখন আসবেন, তিনি তখন করে' নেবেন...

রাঁধিবার কোন আয়োজন সে করিল না। খানিকটা বসিয়া বসিয়া তাহার মনে হইল

ততক্ষণ মশলাগুলা বাটিয়া রাখা যাক্। সে মাঝে মাঝে কাজের সুবিধার জন্য কয়েকদিনের মশলা একসঙ্গে বাটিয়া রাখিত।

বেলা প্রায় দশটার সময় একটি অল্পবয়সী ফুটফুটে বউ, পরনে একখানা পুরানো চেলীর কাপড়, হাতে থাকিবার মধ্যে দুগাছি শাঁখা—একটি বাটি হাতে রান্নাঘরের দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিয়া বলিল—দিদি আছ নাকি?

সুশীলা মশলা বাটিতে বাটিতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল—আয় আয় ছোট বউ—আয় না ঘরের মধ্যে—ঠাকরুণ নেই···

বউটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—একি দিদি, এত বেলা হ'ল এখনও রান্না চড়াওনি যে!

সুশীলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—রান্না চড়াব! হাঁড়ি-কুড়ি ভেঙে ফেলি নি এই কত!···

বউটির চোখে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, সে বলিল—না দিদি, ও-সব কিছু কোরো না, ভাত চড়িয়ে দাও লক্ষ্মীটি, নইলে জান তো কি রকম লোক সব···

—দেব—দেখবে সব আজ কি রকম মজা, রোজ রোজ কাঠ কাটবো আর ভাত রাঁধবো, উঃ!

—কাঠ নেই বুঝি? আচ্ছা, দা-খানা দাও দিদি, আমি দিচ্ছি কেটে।

—তোর কি দায় তুই দিতে যাবি? বোস ঠাণ্ডা হয়ে—যাদের গরজ আছে তারা নিজেরা বুঝুক গিয়ে···

—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, দাও রান্নাটা চড়িয়ে, জান তো ওরা···

—তুই বোস দেখি ওখানে চুপ ক'রে, দেখিস এখন মজা—আজ দু'মাস ধরে রোজ বলছি কাঠ নেই, কথা কানে যায় না কারুর—আজ মজাটি দেখাবো···

সুশীলার একগুঁয়েমিতে বউটি কিছু ভীতা হইল, কারণ মজা কোন্ পক্ষ দেখিবে এ সম্বন্ধে তাহার একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে না পারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

এই বউটি রামতনু মুখুয্যের জ্যাঠতুত ভাই রামলোচন মুখুয্যের পুত্রবধূ। পাশেই এদের বাড়ি। রামলোচনের অবস্থা খুবই খারাপ—তা সত্ত্বেও তিনি বছর দুই হইল ছেলের বিবাহ দিয়াছেন—রামলোচনের স্ত্রী ছিল না, পুত্রবধূই গৃহিণী। দুরবস্থার সংসারে ছেলেমানুষ বউকে সংসার করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে-অসময়ে বাটি হাতে খুঁচি হাতে এ বাড়িতে হাত পাতিয়া তেলটা নুনটা লইয়া যাইত, চাউল না থাকিলে আঁচলে করিয়া চাউল লইয়া যাইত—ধার বলিয়াই লইয়া যাইত—কখনও শোধ করিতে পারিত, কখনও পারিত না।

মোক্ষদা ঠাকরুণকে বউটি বড় ভয় করে—তিনি থাকিলে জিনিসপত্র তো দেনই না, যদি বা দেন তাহা বহু মিষ্ট বাক্যবর্ষণ করিবার পর। তবু বউটির আসিতে হয়, কি করিবে, অভাব। সুশীলা তাহাকে মোক্ষদা ঠাকরুণের হাত হইতে বাঁচাইয়া গোপনে এটা ওটা যখন যাহা দরকার সাধ্যমত সাহায্য করিত। সামান্য একবাটি তেল লইয়া গেলেও হুঁশিয়ার মোক্ষদা ঠাকরুণ তাহা কখনও ভুলিতেন না—গলা টিপিয়া কড়া-ক্রান্তিতে তাহা আদায়

করিয়া ছাড়িতেন। সুশীলা ছিল অগোছালো ও অন্যমনস্ক-ধরনের মানুষ, সে ধার দিয়া অত-শত মনেও রাখিত না, বা সামান্য তেল নুন ধার দিয়া আদায় করিবার কোন চেষ্টাও করিত না—শোধ দিতে আসিলে অনেক সময় বলিত—ওই তুই আবার দিতে এলি কেন ভাই ছোট বউ, ওর আবার নেব কি? যা, ও তুই নিয়ে যা ভাই।

সুশীলা আপন মনে খানিকক্ষণ বকিয়া বউটির দিকে চাহিয়া বলিল—তারপর, তোর রান্নাবান্না?

বউটি বাটিটা আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, বাহির করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল—সেদিনকার সেই তেল নিয়ে গিয়েছিলাম দিদি, তা আমাদের এখনও আনা হয় নি। আজ রাঁধবার তেল নেই—একসঙ্গে দুদিনের দিয়ে যাবো—সেইজন্যে···

সুশীলা বলিল—আচ্ছা, নিয়ে আয় দেখি বাটি। দেখি কি আছে, আমাদেরও বুঝি তেল আনা হয় নি।

পাত্রে যতটুকু তেল ছিল সুশীলা সবটুকু এই কুণ্ঠিতা দরিদ্রা গৃহলক্ষ্মীটিকে ঢালিয়া দিল। বউটি চলিয়া যাইবার সময় মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—লক্ষ্মী দিদি, দাও রান্না চড়িয়ে···

সুশীলা বলিল—তুই পালা দেখি—আমি ওদের মজা না দেখিয়ে আজ আর কিছুতেই ছাড়ছি নে...

বেলা বারোটার সময় মোক্ষদা ঠাকরুণ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া হইচই বাধাইয়া দিলেন। প্রকৃতই ইহাতে রাগ হইবার কথা। একটু পরে রামতনু আসিলেন, তিনি ব্যাপার দেখিয়া দালানে গিয়া আপন মনে তামাক টানিতে শুরু করিলেন। ঝগড়া ক্রমে খুব চাগাইয়া উঠিল, মোক্ষদা উচ্চৈস্বরে সুশীলার কুলজি গাহিতে লাগিলেন।—সুশীলাও যে খুব শান্তশিষ্ট, এ অপবাদ তাহাকে শত্রুতেও দিতে পারিত না, কাজেই ব্যাপার যখন খুব বাধিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে কিশোরী আসিয়া হাজির হইল—যদিও আজ তাহার ফিরিবার কথা ছিল না, তবুও কাজ মিটিয়া যাওয়াতে সে আর সেখানে অপেক্ষা করে নাই। মোক্ষদা ছেলেকে পাইয়া হাঁকডাক আরও বাড়াইয়া দিলেন। কিশোরী এত বেলায় বাড়ি আসিয়া এ অশান্তির মধ্যে পড়িয়া অত্যন্ত চটিয়া গেল—তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল স্ত্রীর উপর। হাতের গোড়ায় একখানা শুকনো চেলা-কাঠ পড়িয়াছিল, সেইটা লইয়াই লাফাইয়া সে রান্না-ঘরের দাওয়ায় উঠিল। সুশীলা তখনও বসিয়া বাটনা বাটিতেছিল—স্বামীকে শুকনা কাঠ হাতে লইয়া বীরদর্পে রান্নাঘরে লাফাইয়া উঠিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল—আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হাত দুটা তুলিয়া নিজের দেহটা আড়াল করিবার চেষ্টা করিল—কিশোরী প্রথমতঃ স্ত্রীর খোঁপা ধরিয়া এক হেঁচকা টান দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, তারপর তাহার পিঠে কয়েক ঘা চেলা-কাঠের বাড়ি মারিয়া তাহার গলা ধরিয়া প্রথমে এক ধাক্কা মারিল রান্নাঘরের দাওয়ার এবং তথা হইতে এক ধাক্কা দিল একেবারে উঠানে। ধাক্কার বেগ সামলাইতে না পারিয়া সুশীলা মুখ থুবড়িয়া উঠানে পড়িয়া গেল—

মার আরও চলিত, কিন্তু রামতনু তামাক খাইতে খাইতে ছেলের কাণ্ড দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িলেন।

পাশের বাড়ির বউটি তখন শ্বশুর ও স্বামীকে খাওয়াইয়া সবে নিজে খাইতে বসিতেছিল, হঠাৎ এ-বাড়ির মধ্যে মারের শব্দ শুনিয়া সে খাওয়া ফেলিয়া সুশীলাদের খিড়কিতে ছুটিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল—সুশীলা উঠানে দাঁড়াইয়া আছে; সর্বাঙ্গে ধূলা, বাটনার পাত্রের উপর পড়িয়া গিয়াছিল, কাপড়ে চোপড়ে হলুদের ছোপ; মাথার খোঁপা একধারে খুলিয়া কতক চুল মুখের উপর কতক পিঠের উপর পড়িয়াছে; গাঙ্গুলী-বাড়ি হইতে দুটো ছেলে ব্যাপার দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে, আরও দু-একজন পাড়ার মেয়ে সামনের দরজা দিয়া উঁকি মারিতেছে—ওদিকে পাঁচিলের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহার নিজের শ্বশুর রামলোচন মজা দেখিতেছেন।

চারিদিকের কৌতূহলদৃষ্টির মাঝখানে, সর্বাঙ্গে হলুদের ছোপ ও ধূলিমাখা বিস্রস্তকুন্তলা, অপমানিতা দিদিকে অসহায়ভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কি-রকম করিয়া উঠিল—কিন্তু সে একে ছেলেমানুষ তাহাতে অত্যন্ত লজ্জাশীলা, শ্বশুর ভাসুর এবং এক-উঠান লোকের মধ্যে বাড়ির ভিতর ঢুকিতে না পারিয়া প্রথমটা সে খিড়কির বাহিরে আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল, কিন্তু গাঙ্গুলী-বাড়ির প্রৌঢ় গাঙ্গুলী মহাশয়ও যখন হুঁকা হাতে—কি হে রামতনু, বলি ব্যাপারখানা কি শুনি—বলিয়া বাড়ির মধ্যের উঠানে আসিয়া হাজির হইলেন, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সুশীলার হাত ধরিয়া খিড়কি-দোর দিয়া বাহিরে লইয়া গিয়াই হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—কেন ও-রকম করতে গেলে দিদিমণি, লক্ষ্মীটি, তখনই যে বারণ করলাম?···

তার পরদিন দুপুরবেলা সুশীলা রান্নাঘরে রাঁধিতেছিল। কিশোরী খাইতে বসিয়াছে, মোক্ষদা ঠাকরুণ কি প্রয়োজনে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সুশীলা পিছনে ফিরিয়া ভাত বাড়িতে বাড়িতে স্বামীর ডালের বাটিতে কি গুলিতেছে, পাশে একটা ছোট বাটি। মোক্ষদার কি-রকম সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা, তোমার বাটিতে কি?—কি মেশাচ্ছ ডালের বাটিতে?

সুশীলা পিছন ফিরিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া মোক্ষদার সন্দেহ আরও বাড়িল—তিনি বাটিটা হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন তাহাতে সবুজ মত কি একটা বাটা।

তিনি কড়াসুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বেটেছ এতে?

তিনি দেখিলেন পুত্রবধূ উত্তর দিতে পারিতেছে না, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল। মোক্ষদা ঠাকরুণ বাটি হাতে—ওমা কি সর্বনাশ! আর একটু হ'লেই হয়েছিল গো,—বলিয়া উঠানে আসিয়া চীৎকার করিয়া হাট বাধাইলেন।

কিশোরী দালান হইতে উঠিয়া আসিল, রামতনু আসিলেন, গাঙ্গুলী-বাড়ির মেয়েপুরুষ আসিল, আরও অনেকে আসিল।

মোক্ষদা সকলের সামনে সেই বাটিটা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, ভাখো তোমরা সকলে, তোমরা ভাব শাশুড়ী-মাগী বড় দুষ্টু—নিজের চোখে দেখে নাও ব্যাপার, কি সর্বনাশ হয়ে যেত এখনি, যদি আমি না দেখতাম—দোহাই বাবা তারকনাথ, কি ঠেকানই আজ ঠেকিয়েছ···

এক-উঠান লোক—সকলেই শুনিল রামতনুর দুরন্ত পুত্রবধূ স্বামীর ভাতে বিষ না কি মিশাইয়া খাওয়াইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। কেউ অবাক হইয়া গেল, কেউ মুচকি হাসিয়া বলিল—ও-সব আমরা অনেককাল জানি, আমরা রীত দেখলেই মানুষ চিনি, তবে পাড়ার মধ্যে বলে এতদিন···

কে একজন বলিল—জিনিসটা কি তা দেখা হয়েছে ?···

মোক্ষদা ঠাকরুণের গাল-বাদ্যের রবে সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।

গাঙ্গুলী মহাশয় রামতনুকে বলিলেন—গুরু রক্ষা করেছেন! এখন যত শীগগির বিদেয় করতে পার তার চেষ্টা করো, শাস্ত্রে বলে, দুষ্টা ভার্যে! আর একদিনও এখানে রেখো না।

সমস্ত দিন পরামর্শ চলিল।

সন্ধ্যার সময় ঠিক হইল কাল সকালেই গাড়ি ডাকিয়া আপদ বিদায় করা হইবে, আর একদিনও এখানে না, কি জানি কখন কি বিপদ ঘটাইবে। বিশেষতঃ পাড়ার মধ্যে ও-রকম দজ্জাল বউ থাকিলে পাড়ার অন্য অন্য বউ-ঝিও দেখাদেখি ঐরকমই হইয়া উঠিবে।

সেদিন রাত্রে সুশীলাকে অন্য একঘরে শুইতে দেওয়া হইল—ইহা মোক্ষদা ঠাকরুণের বন্দোবস্ত—কাল সকালেই যখন যেখানকার আপদ সেখানে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে, তখন আর তাহার সঙ্গে সম্পর্ক কিসের ?

রাত্রে শুইয়া শুইয়া কত রাত পর্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না। ঘরের জানালা সব খোলা, বাহিরের জ্যোৎস্না ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে কাল ও আজ এই দুইদিন অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে—সে স্বভাবত নির্বোধ, লাঞ্ছনা ভোগের অপমান সে ইহার পূর্বে কখনও তেমন করিয়া অনুভব করে নাই, যদিও মারধর ইহার পূর্বে বহুবার খাইয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে আজ ও কালকার দিনের মত শ্বশুরশাশুড়ী ও এক-উঠান লোকের সামনে এভাবে অপমানিতাও সে কোনদিন হয় নাই। তাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চোখের জল বাঁধ মানিতেছে না—কাল মার খাইয়া পিঠ কাটিয়া গিয়াছে ও হাত দিয়া ঠেকাইতে গিয়া হাতের কাঁচের চুড়ি ভাঙিয়া হাতও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহার সেই স্বামী, যে স্বামী পাঁচছয় বৎসর পূর্বে এমন সব রাতে তাহাকে সমস্ত রাত ঘুমাইতে দিত না, সে পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত ভুলাইয়া পান মুখে গুঁজিয়া দিত—সেই স্বামী এরূপ করিল ?

পান খাওয়ানোর কথাটিই সুশীলার বার-বার মনে আসিতে লাগিল। রাত্রের জ্যোৎস্না ক্রমে আরও ফুটিল। তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি-পাতা-ওঠা গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসন্ত-মধ্যাহ্ন ধোঁয়া ধোঁয়া রৌদ্রের উত্তরীয় উড়াইয়া বেড়ায়···দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি প্রস্ফুট-প্রসূন-সুরভির মধ্য দিয়া চলিয়া চলিয়া নদীর ধারের

শিমুলতলায় সন্ধ্যার ছায়ার কোলে গিয়া ঢলিয়া পড়ে..পাড়াগাঁয়ের আমবনে বাঁশবনে জ্যোৎস্না-ঝরা বাতাসে সারারাত কত কি পাখীর আনন্দ-কাকলী...বসন্ত লক্ষ্মীর প্রথম প্রহরের আরতির শেষে বনের গাছপালা তখন আবার নূতন করিয়া টাট্‌কা ফুলের ডালি সাজাইতেছে।...

শুইয়া শুইয়া সুশীলা ভাবিল, জগতে কেউ তাহাকে ভালবাসে না—কেবল ভালবাসে তাহার মৌরীফুল। মৌরীফুল পত্র লিখিয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া সে রোজ রাত্রে কাঁদে, তাহাকে না দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার কষ্ট হইতেছে। সত্যই যদি কেউ তাহাকে ভালবাসে তো সে ওই মৌরীফুল—আর ভালবাসে ওই ছোট-বউটা। আহা, ছোট-বউ-এর বড় কষ্ট। ভগবান দিন দিলে সে ছোট-বউ-এর দুঃখ ঘুচাইবে।...কিন্তু স্বামী যে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছে? ও কিছু না, অভাবে পড়িয়া উহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে, নহিলে সেও কি এমন ছিল? মৌরীফুলের বর তো কত জায়গায় বেড়ায়, মৌরীফুলকে একখানা পত্র লিখিয়া দেখিলে হয়, যদি উহার কোন চাকরি করিয়া দিতে পারে। চাকরি হইলে সে আর তার স্বামী একটা আলাদা বাসায় থাকিবে, আর কেহই সেখানে থাকিবে না, মাঠের ধারের ছোট ঘরখানি সে মনের মত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে, উঠানে কুমড়ার মাচা বাঁধিবে, বাজার-খরচ কমিয়া যাইবে। লোকে বলে সে গোছালো নয়, একবার বাসায় যাইলে সে দেখাইয়া দিবে যে সে গোছালো কি না। আচ্ছা, ওই বাড়িখানায় যদি আগুন লাগে। না—আগুন দিবে কে? ছোট-বউ, উঁহুঁ, দিলে তাহার শাশুড়ী ঠাকরুণই দিবে, যে রকম লোক।

জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নায় ও-গুলো কি ভাসিতেছে? সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎস্না-রাত্রে পরীরা সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো?...তাহার বিবাহের রাত্রে কেমন বাঁশী বাজাইয়াছিল, কেমন সুন্দর বাঁশী ওরকম বাঁশী নদীর ধারে কত পড়িয়া থাকে...আচ্ছা পিওনে মৌরীফুলের একখানা চিঠি দিয়া গেল না কেন? লাল চৌকা খাম, খুব বড়, সোনার জল দেওয়া, আতর না কি মাখান...

পরদিন সকাল বেলা পুত্রবধূর উঠিবার দেরী হইতে লাগিল দেখিয়া মোক্ষদা ঠাকরুণ ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, পুত্রবধূ জ্বরের ঘোরে অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়িয়া আছে, চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল।...

সেদিন সমস্ত রাত একভাবেই কাটিয়া গেল, তাহার দিকে বিশেষ কেহ নজর করিল না, তার পরদিন বেগতিক বুঝিয়া রামতনু ডাক্তার আনিলেন। দুপুরের পর হইতে সে জ্বরের ঘোরে ভুল বকিতে লাগিল—সত্যি মৌরীফুল তা নয়, ওরা যা বলছে—আমি অত ভেবে...

সন্ধ্যার কিছুপূর্বে সে মারা গেল।

তাহার মৃত্যুতে গাঙ্গুলী-পাড়ায় হাড় জুড়াইয়া গেল, পাড়ার কাক-চিলগুলাও একটু সুস্থির হইল। কিছুদিন পরেই কিশোরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মেঘলতা ঘরে আসিল। দেখিলে চোখ জুড়ায় এমন সুন্দর মেয়ে, কর্মপটু, হুঁশিয়ার, গোছালো। দ্বিতীয়বার বিবাহের অল্পদিন

পরেই যখন কিশোরী পালেদের স্টেটে ভাল চাকরিটা পাইল, তখন নূতন বউ-এর লক্ষ্মীভাগ্য দেখিয়া সকলেই খুব খুশি হইল।

সংসারের অলক্ষ্মীস্বরূপা আগের পক্ষের বউ-এর নাম সে সংসারে আর কোনদিন কেহ করে না।

জলসত্র

বৃদ্ধ মাধব শিরোমণি-মশায় শিষ্য-বাড়ি যাচ্ছিলেন।

বেলা তখন একটার কম নয়। সূর্য মাথার উপর থেকে একটু হেলে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠ-মাসের খররৌদ্রে বালি গরম, বাতাস একেবারে আগুন, মাঠের চারিধারে কোনদিকে কোন সবুজ গাছপালার চিহ্ন চোখে পড়ে না। এক-আধটা বাবলা গাছ যা আছে তাও পত্রহীন। মাঠের ঘাস রোদপোড়া—কটা। ব্রাহ্মণের কাপড়-চোপড় গরম হাওয়ায় আগুন হয়ে উঠলো, আর গায়ে রাখা যায় না। এক-একটা আগুনের ঝলকের মত দমকা হাওয়ায় গরম বালি উড়ে এসে তাঁর চোখে-মুখে তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুরবেলা এ-মাঠ পার হতে যাওয়া যে ইচ্ছে করে' প্রাণ দিতে যাওয়ার সামিল, এ-কথা নবাবগঞ্জের বাজারে তাঁকে অনেক বলেছিল, তবুও যে তিনি কারুর কথা না শুনে জোর করেই বেরুলেন, সে কেবল বোধহয় কপালে দুঃখ ছিল বলেই।

পশ্চিম দিকে অনেক দূরে একটা উলুখড়ের ক্ষেত গরম বাতাসে মাথা দোলাচ্ছিল। যে-দিকে চোখ যায়, সে-দিকেই কেবল চক্‌চকে খরবালির সমুদ্র। ব্রাহ্মণের ভয়ানক তৃষ্ণা পেল, গরম বাতাসে শরীরের সব জল যেন শুকিয়ে গেল, জিব জড়িয়ে আসতে লাগলো। তৃষ্ণা এত বেশী হোল যে, সামনে ডোবার পাতা-পচা কালো জল পেলেও তা তিনি আগ্রহের সঙ্গে পান করেন। কিন্তু নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত সাড়ে চার ক্রোশ বিস্তৃত এই প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে যে কোথাও জল পাওয়া যায় না, তা তো তাঁকে কেউ কেউ বাজারেই বলেছিল। এ কষ্ট তাঁকে ভোগ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণ কিন্তু ক্রমেই ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর কান দিয়ে, নাক দিয়ে নিশ্বাসে যেন আগুনের ঝলক বেরুতে লাগলো। জিব জোর করে' চুষলেও তা থেকে আর রস পাওয়া যায় না, ধূলোর মত শুকনো। চারিদিকে ধূ-ধূ মাঠ খররৌদ্রে যেন নাচছে···চক্‌চকে বালিরাশি রোদ ফিরিয়ে দিচ্ছে . মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘূর্ণি হাওয়া গরম বালি-ধুলো-কুটো উড়িয়ে নাকে-মুখে নিয়ে এসে ফেলছে।...অসহ্য পিপাসায় তিনি চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখতে লাগলেন। মনে হোতে লাগলো—একটু ঘন সবুজ মত যদি কোন পাতাও পাই তা হলে চুষি···জীবনে তিনি যত ঠাণ্ডা জল খেয়েছিলেন তা' এইবার তাঁর একে একে মনে আসতে লাগলো। তাঁর বাড়ির পুকুরের জল কত ঠাণ্ডা...পাহাড়পুরের কাছারির ইঁদারার জল সে

তো একেবারে বরফ···কবে তিনি শিষ্যবাড়ি গিয়েছিলেন, বৈশাখ মাসের দিন তারা তাঁকে বড় সাদা কাঁসার ঘটি করে' নতুন কলসীর জল খেতে দিয়েছিল, সে জল একেবারে হিম, খাবার সময় দাঁত কনকন করে। আচ্ছা, এখন যদি সেই রকম এক ঘটি জল কেউ তাঁকে দেয় ?··· তাঁর তৃষ্ণাটা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে বুকের কলজে পর্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠলো। এ মাঠটাকে এ অঞ্চলে বলে কচু-চুষির মাঠ। তাঁর মনে পড়লো তিনি শুনেছিলেন, এ জেলার মধ্যে এত বড় মাঠ আর নেই; আগে আগে অনেকে নাকি বৈশাখ-জৈ্যষ্ঠ মাসের দুপুরে এ মাঠ পার হতে গিয়ে সত্যি সত্যি প্রাণ হারিয়েছে, গরম বালির ওপর তাদের নির্জীব দেহ লটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। অসহ্য জল-তৃষ্ণায় তারা আর চলতে অক্ষম হয়ে গরম বালির ওপর ছটফট করে' প্রাণ হারিয়েছে!···সত্যিই তো!···এখনও তো দু'ক্রোশ দূরে গ্রাম ..যদি তিনিও ?

শুধু মনের জোরে তিনি পথ চলতে লাগলেন। এই পথ-হাঁটার শেষে কোথায় যেন এক ঘটি ঠাণ্ডা কনকনে হিমজল তাঁর জন্যে কে রেখে দিয়েছে, পথ-হাঁটার বাজী জিতলে সেই জলঘটিটাই যেন তাঁর পুরস্কার, এই ভেবেই তিনি কলের পুতুলের মত চলছিলেন। আধ-ক্রোশটাক পথ চলে' উলুখড়ের বনটা ডাইনে ফেলেই দেখলেন, বোধহয় আর আধ ক্রোশ পথ দূরে একটা বড় বটগাছ। গাছটার তলায় কোন পুকুর হয়তো থাকতে পারে, না থাকে, ছায়াও তো আছে ?

বটতলায় পৌঁছে দেখলেন একটা জলসত্র! চার-পাঁচটা নূতন জালায় জল, এক পাশে একরাশি কচি ডাব! এক ধামা ভিজে ছোলা, একটা বড় জায়গায় অনেকটা নতুন আখের গুড়, একটা ছোট ধামায় আধ ধামা বাতাসা! বাঁশের চেরা একটা খোল কাতার দড়ি দিয়ে আর একটা বাঁশের খুঁটির গায়ে বাঁধা। একজন জালা থেকে জল উঠিয়ে চেরা বাঁশের খোলে ঢেলে দিচ্ছে। আর লোকে বাঁশের খোলের এ-মুখে অঞ্জলি পেতে জল পান করছে।

গাছতলায় যারা বসেছিল, ব্রাহ্মণ দেখে শিরোমণি-মহাশয়কে তারা খুব খাতির করলে। একজন জিজ্ঞাসা করলে—ঠাকুর মশায়ের আগমন হচ্ছে কোথা থেকে ?

একজন বলল—আহা, সে কথা রাখো, বাবা-ঠাকুর আগে ঠাণ্ডা হোন।

শিরোমণি মশায় যেখানে বসলেন, সেখানে প্রকাণ্ড বটগাছটা প্রায় দু'তিন বিঘা জমি জুড়ে আছে। হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা লম্বা ঝুরি চারিদিকে নেমেছে।...একজন তাঁকে তামাক সেজে দিয়ে একটা বটপাতা ভেঙে নিয়ে এল নল' করবার জন্যে।···আঃ, কি ঝিরঝিরে হাওয়া! এই অসহ্য পিপাসা ও গরমের পর এমন ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ও তৈরী-তামাকে তাঁর তৃষ্ণাও যেন অনেকটা কমে' গেল।

তামাক খাওয়া শেষ হোল। একজন বললে—ঠাকুর-মশায়, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন। ভাল সন্দেশ আছে ব্রাহ্মণদের জন্যে আনা, সেবা করে' একটু জল খান, এই রোদে এখন আর যাবেন না—বেলা পড়ুক।

তারপর শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এ জলসত্র কাদের ?

—আজ্ঞে ঐ আমডোবের বিশ্বেসদের। শ্রীমন্ত বিশ্বেস আর নিতাই বিশ্বেস নাম শুনেছেন ?

শিরোমণি মশায় বললেন—বিশ্বেস ? সদ্‌গোপ ?

—আজ্ঞে না, কলু।

সর্বনাশ ! নতুন মাটির জালা ভর্তি জল ও কচি ডাবের রাশি দেখে পিপাসার্ত শিরোমণি-মশায় যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, তা তাঁর এক মুহূর্তে কর্পূরের মত উবে গেল। কলুর দেওয়া জলসত্রে তিনি কি করে' জল খাবেন ? তিনি নিজে এবং তাঁর বংশ চিরদিন অশূদ্রে প্রতিগ্রাহী ; আজ কি তিনি—ওঃ ! ভাগ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।—নইলে, এখনি তো...

শিরোমণি-মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—এ জলসত্র কতদিনের দেওয়া ?

—তা আজ প্রায় পনেরো-ষোল বছর হবে। শ্রীমন্ত বিশ্বেসের বাপ তারাচাঁদ বিশ্বেস এই জলসত্র বসিয়ে যায়। সে হয়েছিল কি বলি শুনুন। বলে' লোকটা সেই কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে।

আমডোবের তারাচাঁদ বিশ্বেস যখন ছোট, চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স তখন তার বাপ মারা যায়। সংসারে কেবল ন'-দশ বছরের একটি বোন ছাড়া তারাচাঁদের আর কেউ ছিল না। ভাই-বোনে মাথায় করে' কলা বেগুন কুমড়ো এইসব হাটে বিক্রি করতো ; এতেই তাদের সংসার চলতো। সেবার বোশেখ মাসের মাঝামাঝি তারাচাঁদ ছোট বোনটিকে নিয়ে নবাব-গঞ্জের হাটে তালশাঁস বিক্রি করতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় তারাচাঁদ মাঠের আর কিছু ঠিক পায় না—নবাবগঞ্জ থেকে রতনপুর পর্যন্ত এই মাঠটা সাড়ে চার ক্রোশের বেশী হবে তো কম নয়। কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই। বোশেখ মাসের দুপুর রোদে মাঠ বেয়ে আসতে তারাচাঁদের ছোট বোনটা অবসন্ন হয়ে পড়লো। তারাচাঁদের নিজের মুখে শুনেছি ছোট বোনটি মাঠের মাঝামাঝি এসে বললে—দাদা, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, জল খাবো।

তারাচাঁদ তাকে বোঝালে, বললে—একটু এগিয়ে চল, রতনপুরের কৈবর্ত পাড়ায় জল খাওয়াবো।

সেই 'একটু আগিয়ে' মানে দু'ক্রোশের কম নয়। আর খানিকটা এসে মেয়েটা তেষ্টায় রোদে অবসন্ন হয়ে পড়লো। বারবার বলতে লাগলো—ও দাদা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, দে আমায় একটু জল···

তারাচাঁদ তাকে কোলে তুলে নিয়ে এই বটগাছটার ছায়ায় নিয়ে এসে ফেললে। ছোট মেয়েটা তখন আর কথা বলতে পারছে না। তারাচাঁদ তার অবস্থা দেখে তাকে নামিয়ে রেখে ছুটে জলের সন্ধানে গেল। এখান থেকে আধক্রোশ তফাতে রতনপুরের কৈবর্তপাড়া থেকে এক ঘটি জল চেয়ে এনে দেখে, তার ছোট বোনটা গাছতলায়, মরে' পড়ে আছে, তার মুখে একটা কচুর ডগা ! এই বটগাছটা তখন ছোট ছিল, ওরই তলায় অনেক কচুবন ছিল। তেষ্টায় যন্ত্রণায় মেয়েটা সেই বুনো কচুর ডগা মুখে করে' তার রস চুষেছিল—সেই থেকে এই মাঠটার নাম হোল কচু-চুষির মাঠ।

তারাচাঁদ বিশ্বেস ব্যবসা করে' বড়লোক হয়েছিল। শুনেছি নাকি তার সে বোন

তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলতো—দাদা, ঐ মাঠের মধ্যে সকলের জল খাবার জন্য তুই একটা জলসত্র করে' দে ?···তাই তারাচাঁদ বিশ্বেস এখানে এই বটগাছ পিত্তিষ্ঠে করে' জলসত্র বসিয়ে গেছে—সে আজ পনেরো ষোল কি বিশ বছরের কথা হবে। ঠাকুরমশায়, কচু-চুবির মাঠের এ জলসত্র এদিকের সকলেই জানে। বলবো কি বাবা ঠাকুর, এখনও শুনেছি যে মাঠের মধ্যে জলতেষ্টায় বেঘোরে পড়ে' ঘুরপাক খাচ্ছে, এমন লোক না কি কেউ কেউ দেখেছে একটা ছোট মেয়ে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছে—ওগো আমি জল দেবো, তুমি আমার সঙ্গে এস।···

লোকটা তার কাহিনী শেষ করলে; তারপর বললে—সত্যি-মিথ্যে জানি নে ঠাকুর-মশায়, লোকে বলে তাই শুনি, বোশেখ মাসের দিন ব্রাহ্মণের কাছে মিথ্যে বলে কি শেষকালে···

লোকটা দুই হাতে নিজের কান মলে' কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে এক প্রণাম করলে।

বেলা পড়ে' এল। কতলোক জলসত্রে আসতে-যেতে লাগলো। একজন চাষা পাশের মাঠ থেকে লাঙল ছেড়ে বটতলায় উঠলো। ঘেমে সে নেয়ে উঠেছে। একটু বিশ্রাম করে' সে তৃপ্তির সঙ্গে ছোলা, গুড় আর জল খেয়ে বসে' গল্প করতে লাগলো।

এক বুড়ী অন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে' ফিরছিল। গাছতলায় এসে সে ঝুলি নামিয়ে একটু জল চেয়ে নিয়ে হাত-পা ধুলে। একজন বললে—আবদুলের মা, একটা ভাব খাবা ?

আবদুলের মা একগাল হেসে বললে—তা দ্যাও দিকি মোরে, আজ অ্যাকটা খাই। মরবো তো, খেয়েই মরি।

একজন লোক পরনে টাট্‌কা ফোরা কাপড়ের ওপর নতুন পাটভাঙা ধপধপে সাদা টুইলের শার্ট, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তোলা পায়ে এক-পা ধুলো, বটতলায় এসে হতাশভাবে ধপ করে' বসে' পড়লো। কেউ জিজ্ঞাসা করলে—ছমিরুদ্দি মিঞা যে, আজ ছানির দিন ছিল না ?

ছমিরুদ্দি সম্পূর্ণ ভদ্রতাসঙ্গত নয় এরূপ একটি বাক্য উচ্চারণ করে ভূমিকা ফেঁদে তার মকদ্দমার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করে' গেল এবং যে উকীলের হাতে তার কেস ছিল, তার সম্বন্ধে এমন কতকগুলো মন্তব্য প্রকাশ করলে যে, তিনি সেখানে উপস্থিত থাকলে ছমিরুদ্দির বিরুদ্ধে আর একটা কেস হোত। তারপর সে পোয়াটাক আখের গুড়ের সাহায্যে আধসের আন্দাজ ভিজে-ছোলা উদরসাৎ করে' একছিলিম তামাক খেয়ে বিদায় নিলে।

ক্রমে রোদ পড়ে' গেল। বৈকালের বাতাসে কাছেরই একটা ঝোপ থেকে ভাঁশা খেজুরের গন্ধ ভেসে আসছিল। হলুদে রংএর সোঁদালী ফুলের ঝাড় মাঠের পেছনটা আলো করে' ছিল। একটা পাখী আকাশ বেয়ে ডানা মেলে চলেছিল—বৌ কথা-ক'—বৌ কথা-ক'।

নিরোমণি-মশায়ের বসে' বসে' মনে হোল, বিশ বছর আগে, তাঁর আট বছরের পাগলী মেয়ে উমার মতই ছোট একটি মেয়ে এই বটতলায় অসহ্য পিপাসায় জল অভাবে বুনো কচুর ডাঁটার কটু রস চুষেছিল, আজ তারই স্নেহ করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায় বেড়ে উঠে এই জলকষ্টপীড়িত পল্লী-প্রান্তরের একধারে পিপাসার্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরী করেছে।··· এরই তলায় আজ বিশ বছর ধরে সে মঙ্গলরূপিণী জগদ্ধাত্রীর মত দশহাত বাড়িয়ে প্রতি নিদাঘ-

মধ্যাহ্নে কত পিপাসাতুর পল্লী-পথিককে জল যোগাচ্ছে!···চারি ধারে যখন সন্ধ্যা নামে···তপ্ত মাঠ পথ যখন ছায়া-শীতল হয়ে আসে···তখনই কেবল সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সে মেয়েটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় শুভ্র-আঁচল উড়িয়ে কোন অজ্ঞাত ঊর্ধ্বলোকে তার নিজের স্থানটিতে ফিরে চলে' যায়!···তার পৃথিবীর বালিকা-জীবনের ইতিহাস সে ভোলে নি।···

যে লোকটা জল দিচ্ছিল, তার নাম চিনিবাস, জাতে সদ্‌গোপ। শিরোমণি মশায় তাকে বললেন—ওহে বাপু, তোমার ঐ বড় ঘটিটা বেশ করে মেজে এক ঘটি জল আমায় দাও, আর ইয়ে—ব্রাহ্মণের জন্য আনা সন্দেশ আছে বললে না?

রোমান্স

সমীরই প্রথমে কথাটা তুললে।

তার মত এই যে রোমান্স প্রেম ও-সব নভেলিয়ানা কেবল নভেলেই ঘটে, বাস্তব জীবনে ওদের অস্তিত্ব নেই। তাতে সুধীরও যোগ দিল বলে' মনে হোল। ক্রমে ক্রমে বাকী সবাই সমীরের মতেই মত দিল। তারপর ক্লাবের বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চা খেতে খেতে আমাদের গল্পের ধারা শীঘ্রই এসে টেনিসে পৌঁছলো অন্য সব দিনের মতো।

ঘরের কোণে ব্রিজ-টেবিলের আড়ালে রমেনবাবু এতক্ষণ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আরাম-কেদারায় টান হয়ে শুয়েছিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো তর্কেই তিনি যোগ দেননি, বিশেষ কোনো কথাও বলেননি। চায়ের এক চুমুক খেয়েই একটু তাজা হয়ে নিয়ে বললেন—স্যাখো, তোমরা এতক্ষণ বকে' যাচ্ছিলে আমি শুনছিলাম, কথা কইনি বটে কিন্তু যখন কথাটা উঠেছে তখন বলি শোনো। রোমান্স আছে এবং খুবই আছে। জীবনটাই তো একটা প্রকাণ্ড রোমান্স হে—সে-চোখে দেখে ক'জন—দেখবার চোখই বা আছে ক'জনের? আচ্ছা, চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে, এস খেয়ে নেওয়া যাক্—শোন তারপর বলি···

রমেনবাবু আমাদের ক্লাবের নতুন মেম্বর, মাস চারেক হোল যোগ দিয়েছেন। তাঁকে একটু অদ্ভুত ধরনের লোক বলে আমাদের সকলেরই মনে হয়েছে। ব্রিজ, টেনিস, বিলিয়ার্ড, দাবা কোনো খেলাতেই কোনো দিন তিনি যোগ দেন নি। খুব বেশি মেশামেশি বা গল্পও কখনো তাঁকে করতে দেখা যায় না। আপন মনে এসে বসেন, কাগজপত্র পড়েন, সন্ধ্যার আগেই উঠে চলে' যান। কিন্তু লোকটির মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যাতে ক্লাবের সকলে তাঁকে খুব পছন্দ করে। তিনি না এলে, কেন তিনি এলেন না সে সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং আর একটা জিনিস, যা আদৌ ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নয়, সেটা এই যে তিনি উঠে চলে' গেলে তাঁর পেছনে তাঁর সম্বন্ধে মন্দ কথা কেউ কোনো দিন বলতো না।

ইতিমধ্যে চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছলো। রমেনবাবু চা পান শেষ করে রুমালে মুখ মুছে গল্প শুরু করলেন—

বছর কয়েক আগে আমি তখন একটা স্বদেশী ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি ও প্রচারের কার্যে ঢাকা যাই। সেই প্রথম ও-অঞ্চলে যাওয়া। সময়টা শীতের শেষ হলেও কলকাতার ধারণায় আমি শীতের কাপড় সঙ্গে নিয়ে যাইনি বলে' একদফা পদ্মার স্টীমারে, তারপর ট্রেনে শীতে হি হি করে' কাঁপতে কাঁপতে রাত সাড়ে ন'টা দশটার সময় গিয়ে ঢাকায় পৌঁছলাম। আমাদের ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টার ঢাকা শহরের এক ভদ্রলোকের নামে একখানা পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন। তিনি শহরের একজন বড উকীল—নাম এখানে করবার আবশ্যক নেই—তাঁরই বাসায় গিয়ে উঠবো এরকম কথা ছিল।

আমি যখন সে বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে দশটার কম নয়। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কম্পাউণ্ডের বাঁ ধারে ফুল-বাগান, জাফরিতে মাধবীলতা এঁকে-বেঁকে উঠেছে—আলো-আঁধারে পাতার আড়ালে বড় বড় ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ ফুটে রয়েছে—এসব গাড়িতে বসেই কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। গাড়ি থামতেই একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান রুটি সেঁকা ফেলে গাড়ির কাছে এসে সেলাম করে' দাঁড়াল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে' জানলাম উকীলবাবু কি কাজে কুমিল্লাতে গেছেন, আজ তিন চারদিন বাড়ি ছাড়া, কবে আসবেন তার ঠিক নেই। কোচম্যানকে গাড়ি ফেরাতে বলেছি—ডাক বাংলোতেই অগত্যা উঠবো—একটি ছেলে বাড়ির মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দারোয়ানটিও এল—সে যে ইতিমধ্যে কখন বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল আমি লক্ষ্য করিনি। ছেলেটি বললে—বাবা কাল সকালেই আসবেন, আপনি যাবেন না—শুনলে বাবা দুঃখ করবেন। রামদীন, বাবুর জিনিসপত্র নামিয়ে নাও।

সুতরাং র'য়ে গেলাম। আহার ও শয়নের ব্যবস্থা সুন্দর হোল, সারাদিনের পরিশ্রমে শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠে বাইরের বারান্দাতে বসে' কাগজ পড়ছি, গৃহস্বামীর গাড়ি সদর গেট দিয়ে কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকলো। আজ সকালের ট্রেনেই উকীলবাবুর আসবার কথা ছিল—তাই তাঁর গাড়ি স্টেশনে গিয়েছিল তাঁকে আনতে। গৃহস্বামী গাড়ি থেকে আমায় দেখে নেমে আমার পরিচয় জেনে খুব খুশী হলেন। নানাভাবে আপ্যায়িত করলেন, রাত্রে কোন কষ্ট হয়েছে কিনা সেকথাটা অন্ততঃ দশবার এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলেন যে মনে হোল রাত্রে কষ্ট হয়নি বললে তাঁকে হতাশ করা হবে। একদিনের মধ্যে আমি যেন বাড়ির লোক হয়ে পড়লাম সে বাড়িতে। রাত্রে আমার আহারের স্থান হোল বাড়ির মধ্যের দাওয়ায়। পরদিন সকালে আমার বাইরের ঘরে একটি বারো-তেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে চা ও খাবার নিয়ে এল। বেশ ডাগর-ডাগর চোখ, কালো চুলের রাশ পিঠের ওপর পড়েছে, মুখ দেখে বুদ্ধিমতী মনে হয়। চা ও খাবারের পাত্রটা টেবিলের ওপর রেখে সে চলে' যাচ্ছিল, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বুঝি খুকী এ-বাড়িরই না? নাম কি তোমার?

সে হেসে বললে—বীণা।

তারপরই সে চলে' গেল।

পরের দিন সকালে সেই মেয়েটিই আবার চা নিয়ে এল। এ-দিন সে অত শীঘ্র চলে' গেল না। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি বুঝি স্কুলে পড়—না ?

সে বললে—আমি মিডফোর্ড গার্লস স্কুলে পড়ি।

—কোন্ ক্লাসে পড় ?

—এবারে ফোর্থ ক্লাসে উঠেছি এই জানুয়ারী মাসে .

—কি কি বই পড় ?

কিছুক্ষণ ধরে' আমাদের কথাবার্তার ধারা ওই পথ ধরেই বেয়ে চললো।

বিকালে সে আপনিই আবার এল। আমার ঘরের চেয়ারটার হাতলের ওপরে বসলো। বলল—আপনি বুঝি বই লেখেন ?

—কি করে' জানলে বল দেখি ?

—আপনার নাম দেখেছি, আমাদের বাড়িতে মাসিকপত্র আসে, তাতে আছে .

—কই কোন্ মাসিকপত্র আনো তো দেখি।

বীণা দু'তিনখানা মাসিক পত্র নিয়ে এল।

একটাতে আমার "বিদেশী ব্যাঙ্ক ও আমাদের কর্তব্য" বলে একটা অর্থনৈতিক প্রবন্ধ বার হয়েছিল বটে; সেইটা বীণা খানিকক্ষণ ধরে পড়লো। তারপর সেটা মুড়ে রেখে এ-গল্প ও-গল্প করতে লাগলো। আমি মুখে মুখে ট্রান্‌স্লেশন্ জিজ্ঞাসা করলাম—সবগুলোর উত্তর দিলে। ঢাকা মিউজিয়াম দেখতে যাবার ইচ্ছা ছিল। বিকালটায় কিন্তু বীণা অনেকক্ষণ ধরে' ঘরে বসে রইলো—মিউজিয়াম দেখতে না যাওয়া হোলেও কোনো ক্ষতি অনুভব করলাম না।

শেষরাত্রে কি জন্যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কানে গেল বাড়ির মধ্যে মেয়েলি গলায় কে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইউক্লিডের জিওমেট্রি পড়ছে—Two tangents can be drawn to a circle from an external point and they are equal and also subtend—। ভারী আশ্চর্য লাগলো। বীণা নিশ্চয়ই নয়—কারণ ফোর্থক্লাসে জিওমেট্রির ট্যাঙ্‌জেণ্ট কোনো স্কুলেই পড়ানো হয় না—তা ছাড়া সেটা বীণার গলাও নয়। ঘড়িতে দেখলাম রাত চারটে বেজেছে। মনে মনে ইউক্লিডের অপূর্ব প্রভাবকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারলাম না। এই শীতের রাত্রে চারটের সময় কার জ্ঞান-পিপাসা এত প্রবল হয়ে উঠেছে জানবার ভারী ইচ্ছা হোল।

সকালে বীণা চা নিয়ে আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম—বীণা, শেষরাত্রে কে জিওমেট্রি পড়ছিল বাড়ির মধ্যে—তুমি ?

বীণা হেসে বললে—আমি না, ও দিদি—এইবার ম্যাট্রিক দেবে। এই সামনের বুধবার থেকে একজামিন বসবে কিনা ?

আমি বললাম—কই, তোমার দিদি ম্যাট্রিক দিচ্ছেন সে-কথা তো শুনিনি ? স্কুলের গাড়িতে তো তুমিই একলা যাও দেখেছি···

বীণা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বললে—বা রে, বেশ লোক তো আপনি। দিদি তো এ্যালাউ হয়ে বাড়ি বসে পড়ছে—ও বুঝি আমার সঙ্গে রোজ রোজ স্কুলের গাড়িতে পড়তে যাবে?

কথাটা বীণা ঠিকই বলেছে, তার হাসিটা নিতান্ত অসঙ্গত নয় বটে।

সেদিন বিকালে স্কুলের গাড়িটা যখন এসে লাগলো তখন আমি রোয়াকে পায়চারি করছিলাম। বীণাকে নামতে দেখলাম না কিন্তু আর একটি মেয়ে নামলো। বয়স পনরো-ষোল হবে, অপূর্ব সুন্দরী, লাল পাড় সিল্কের জ্যাকেটের বাইরে নিটোল শুভ্র বাহুদুটি যেন হাতীর দাঁতে কুঁদে তৈরী। একবার আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখে শান্তগতিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো।

সন্ধ্যার একটু আগে বীণা এসে বললে—চা এখন আনবো, না বেড়িয়ে এসে খাবেন?.. পরে একটু থেমে বললে—দিদিকে আজ দেখেছেন না?

আমি তখনও ঠিক করতে পারিনি যে স্কুলের গাড়ির সেই মেয়েটিই বীণার দিদি। পূর্বেই বলেছি বীণা ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে আমার মুখ দেখেই ব্যাপার বুঝে নিয়ে বললে—আজ বিকালে স্কুলের গাড়ি থেকে যে নামলো তখন ঐ তো দিদি—আমি তো আজ স্কুলে যাইনি। দিদি রিসিট আনতে স্কুলে গেছলো যে, ও-বেলা...

পরে সে বললে—দিদিই আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, বাইরের ঘরে ও-ভদ্রলোকটি কে রে?

মনে মনে অভিমানে বড় ঘা লাগলো। বড়-মানুষের মেয়ে বটে, সুন্দরীও বটে, কিন্তু আজ ছ'সাতদিন যে আমি তাঁর বাপের বৈঠকখানার একখানা চেয়ার টেবিলের মতো বাইরের ঘরের এক কোণে পড়ে' আছি, এতদিনের মধ্যে এ হতভাগ্যের সম্বন্ধে সে সংবাদটুকুও কি তাঁর কর্ণগোচর হয়নি?

দিন দুই কেটে গেল। এ কয়দিনে আমি নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করলাম তাতে ঠিক সময়ে স্নানাহার হয়ে উঠতো না কোনো দিনও। সুতরাং বীণার সঙ্গে দেখা হবার সময় হোত না। তৃতীয় দিন সকালে বার হয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে ফিরে এলাম। বারান্দাটাতে বসে একটু বিশ্রাম করছি, অপ্রত্যাশিতভাবে বীণা ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে—ঠাকুর দু'বার, তারপর আমি দু'বার আপনাকে ডাকতে এসে ফিরে গিয়েছি—আপনার খিদে-তেষ্টা কিছুই পায় না, কোথায় ছিলেন সারা দিনটা?

আমি কৈফিয়ত দেবার আগেই সে আবার বলে' উঠলো—মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন, আপনার চা নিয়ে আসি—বাবা এখনও কাছারি থেকে ফেরেননি, গরম জল চড়ানই আছে...

অল্প পরেই সে চা নিয়ে এসে অভ্যস্ত ভাবে সামনের চেয়ারের হাতলটার ওপর বসে অনর্গল বকে যেতে লাগলো—সব কথার উত্তর পাবারও প্রত্যাশা সে রাখে না। আপনা আপনিই বেশ বলে যেতে পারে। বললে—ভারী মজা হয়েছে, আমি আপনার একটা লেখা দিদিকে দেখিয়ে বললুম—পড়ে দেখো তো। দিদি পড়তে গিয়ে বুঝতে পারে না—দাঁড়ান সেখানা আনি...

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বাড়ির মধ্যে চলে' গেল, কিন্তু সেদিন আর সে বাইরের ঘরে দেখা দিলে না। বীণার খামখেয়ালি ধরন আমার জানা ছিল কাজেই এতে আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য হলাম না। পর দিন সকালে সে এল—হাতে একখানা "বঙ্গ-বন্ধু"। আমায় দেখিয়ে বললে—এই নিন, দিন দিকি বুঝিয়ে? লাল পেন্সিলে দিদি দাগ দিয়ে দিয়েছে জায়গাগুলো। সেই মাসের "বঙ্গ-বন্ধু"তে আমার "যৌথ-ব্যাঙ্ক ও মধ্যবিত্তের কর্তব্য" বলে প্রবন্ধটা বেরিয়েছিল। হাতে নিয়ে মনে মনে ভাবলাম যদি ম্যাট্রিক ক্লাসের একটি মেয়েকেও তাক লাগিয়ে না দিতে পারলাম তবে অনবরত দিন-পনরো ধ'রে, ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরী যাতায়াত এবং নানান Year-Book নাড়া-চাড়া করবার সার্থকতা আর কি হোল?

বীণা বিকেল বেলা একখানা খাতা হাতে নিয়ে এসে বললে—চা-টা খেয়ে নিন—নিয়ে দিদির এই ট্রান্‌স্লেশন্‌টা হয়েছে কিনা দেখে দিন তো। দিদি বললে আপনাকে দেখাতে···

সেটা হাতে নিয়ে দেখলাম—বেশ গোটা গোটা মুক্তোর ছাঁদের লেখাটা বটে কিন্তু ট্রান্‌স্লেশন্‌টা বিশেষ উঁচুদরের নয়। কাজেই যখন বীণা বললে—ধরুন কুড়ি নম্বর আছে, কত নম্বর দেবেন আপনি? তখন একটু আমতা আমতা করে বললাম—নম্বর? তা এই ধরো, অবিশ্যি বাংলাটা খুব শক্ত, তা ধরো এই চার কি পাঁচ দিতে পারি···

—মোটে? তবেই হয়েছে, দিদি তাহলে এবার ইংরিজিতে ফেল, ফেলতুঃ, ফেলুঃ—কথাটা শেষ করেই সে মুখে হাতখানা চাপা দিয়ে খিল খিল করে' হেসে উঠলো। আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম—না না ফেল কেন হবেন—আর একটা সোজা দেখে করলেই—এটা বেজায় শক্ত কিনা?

বিকেলে এসে বীণা বললে—দিদি বলে দিলে আপনাকে রোজ রোজ তার ট্রান্‌স্লেশন্ দেখে দিতে হবে– পারবেন তো?

—খুব খুব—নিয়ে এসো না কাল থেকে। কেন দেখে দেবো না?

সেদিন থেকে আমার কাজ হোল রোজ রোজ এক রাশ করে' ইংরাজি ও বানানের ভুল সংশোধন করা। বেশ হাতের লেখাটি কিন্তু—খাতার শেষে গোটা গোটা ছাঁদে আমার নেপথ্যপথবর্তিনী ছাত্রীটির নাম লেখা থাকে—প্রতিমা দেবী।

কয়েকদিন খুব গুমটের পর বৈকালের দিকে সেদিন খুব বৃষ্টি হোল। উকীলবাবুর বাড়ির সামনে একটা বড় বটগাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, বারান্দাটাতে বসে' সেদিকে চেয়ে আমি আমার দেশের বাড়ির কথা ভাবছিলাম—কত দিন যাইনি, কাজের খাতিরে বিদেশে বিদেশে বেড়াতে হয়। তবুও যখন নববর্ষ নামে, বৃষ্টি-সজল বাতাসে এখান থেকে তিনশো মাইল দূরের সে গ্রামখানির ভিজে মাটীর গন্ধ যেন ভাসিয়ে আনে...মনে হয় আমার ছোট ভাই অন্তু হয়ত এতক্ষণ আমাদের উঠানের বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে খেলা করছে।... গোঁসাই কাকাদের বৈঠকখানাতে এতক্ষণ তাসের খুব মজলিস বসেছে...তখন মন বড় খারাপ হয়ে যায়, ইচ্ছা হয় চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি গিয়ে উঠি।

উকীলবাবু কয়েকদিন রক্তাধিক্যের অসুখ হওয়ায় বাড়ির মধ্যেই ছিলেন, কাছারিও

যাননি। তিনি ঝড়-বৃষ্টি থামবার পরে বারান্দাতে এসে আমার পাশে একটা আরাম কেদারায় বসে নানা গল্প করতে লাগলেন। বেশ অমায়িক স্বভাবের ভদ্রলোকটি। বললেন —ক'দিন আপনার খোঁজ খবর করতে পারিনি, কোনো অসুবিধে হয়নি আপনার? হ্যাঁ দেখুন, বীণা বলছিল আপনি প্রতিমার ট্রান্‌স্লেশন্ রোজ দেখে দেন—কি রকম বুঝছেন, পাস-টাস করবে? ইংরিজিটা তেমন জানে না, যদি কিছু না মনে করেন তবে আপনাকে একটু অনুরোধ করি মেয়েটিকে একটু করে দেখবেন আপনার সময় মত? শুধু ইংরিজিটা দেখে দিলেই—ওর মাস্টার ছিল, হঠাৎ মা মারা যাওয়াতে বেচারী জানুয়ারী মাসে বাড়ি চলে গেল আর এল না—অবিশ্যি যদি আপনার...

বলা বাহুল্য আমাকে এ-বিষয়ে রাজী করাতে তাঁর যতটা বাক্য ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল, তিনি তার চেয়ে যেন একটু বেশীই করলেন।

তারপর দিন-দুই কেটে গেল। প্রতিমা রোজ বিকেলে নয় দুপুরে খাতা নিয়ে এসে বসে, সঙ্গে থাকে বীণা। কোন কোন দিন সেও থাকে না। ধরনটি ওর ভারি মিষ্টি অথচ ওর মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য আছে যা অবাধ পরিচয়ের পথে একটা সহজ ব্যবধানের সৃষ্টি করে।

সেদিন প্রতিমা এসে সামনের চেয়ারখানাতে বসলো। ট্রান্‌স্লেশন্ দেবার পরে সে মুখ নিচু করে' হেসে বললে—এ আমি পারবো না—এটা বদলে দিন ..

আমি বললাম—এমন আর শক্ত কি, করে' দেখবে এখন সোজা···

সে পুনরায় ঠিক সেই ভাবে হেসে বললে—না আমি পারবো না, আপনি বদলে দিন···

যে সুরে সে কথাটা বললে, সেটা অতি শান্ত মৃদু হলেও মনে হোল এর পর আর তর্ক চলে না। বদলে দিলাম বটে কিন্তু ভাবলাম মেয়েটি একটু একরোখা ধরনের।

পড়াশুনা শেষ করেই প্রতিমা খাতাপত্র উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। একটু পরে বিকেলের দিকে আবার খুব ঝড়বৃষ্টি নামলো—এ অবস্থায় বাইরে বেড়াতে যাওয়া উচিত হবে না বুঝে চুপ করে বারান্দায় আরাম কেদারাটাতে বসে' আছি—পেছনে দোর খোলার শব্দ হোল। চেয়ে দেখি আগে আগে বীণা, পেছনে প্রতিমা ঘরে ঢুকছে। প্রতিমার আগমন অনেকটা অপ্রত্যাশিত—কারণ এক পড়াশোনার সময়টি ছাড়া প্রতিমা অন্য কোন সময়ে আমার এখানে আসেনি কখনো।

বীণা ঘরে ঢুকেই বললে—কেমন বৃষ্টি নেমেছে মাস্টার-মশায়?

—এসো এসো। ভিজতে ভিজতে এলে যে?

—দিদি বললে আপনি একলাটি বসে আছেন তাই চল গিয়ে গল্প···

প্রতিমা তার দিকে ভ্রূকুটি করে' বললে—আমি?

পূর্বে ও-কথাটা মনে হয়েছে এখনও মনে হোল, প্রতিমা যে সুন্দরী তার ব্লাউজের হাতার লাল সিল্কের পাড়ের সঙ্গে সুন্দর খাপখাওয়া শুভ্র বাহু দুটির নিটোল গঠনের দিকে চেয়ে একথা মনে মনে অস্বীকার করতে পারলাম না। কিন্তু সকলের চেয়ে অদ্ভুত তার দু'টি চোখ ও ভুরু

দুটির একটা বিশেষ ভঙ্গি। সেটা কি তা ঠিক মুখে বোঝানো যায় না অথচ যে ধরণের সৌন্দর্যে মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত অভাবের বেদনা সৃষ্টি করে ওর মুখের সৌন্দর্যটা ঠিক সেই ধরনের।

প্রতিমা বললে—একলা বসে থাকতে আপনার খুব ভালো লাগে, না? বসে বসে লেখেন বুঝি? উঃ, কি শক্ত লেখাই লিখেছেন—আচ্ছা অত পার্সেণ্টেজ, গ্রাফ, সেন্সাস রিপোর্ট কোথায় পেলেন—সব বুঝি আপনার মুখস্থ?

—মুখস্থ কি আর থাকে। ও-সব লাইব্রেরীতে গিয়ে বই দেখে লেখা—অত মুখস্থ থাকলে একটা সচল Year Book হয়ে উঠবো যে...

—আচ্ছা আপনার দেশ কোথায়?

—অনেক দূর, বর্ধমান জেলায়। তোমার জিওগ্রাফি আছে ম্যাট্রিকে?

প্রতিমা মৃদু হেসে বললে—জিওগ্রাফি না থাকলেও বর্ধমান জেলা জানি···

বীণা বললে—আমাদের ক্লাসের জিওগ্রাফিতে বর্ধমান জেলার কথা আছে। আচ্ছা, আপনাদের দেশে খুব ধান হয় আর খুব কয়লার খনি আছে, না মাস্টার-মশায়?

—কয়লার খনি নেই এমন নয়, তবে একটু পশ্চিম ঘেঁষে...

প্রতিমা বললে—কয়লার খনি দেখেছেন আপনি? আচ্ছা ও কি করে হয়?

কয়লার খনির উৎপত্তির কথা এসে পড়াতে স্বভাবতঃই অনেক কথা মনে পড়লো। পৃথিবীর আদিম জন্মকথা, নেবুলা, স্তর বিভাগ, বিভিন্ন যুগবিভাগ, সূর্য ও প্রাণীর জন্মের ইতিহাস, জীবাত্মা ও অধুনালুপ্ত অতিকায় জীবদিগের বিবরণ ইত্যাদি। একদিকে প্রতিমার সৌন্দর্য অন্যদিকে এ-সব মহিমাময় বৈজ্ঞানিক রোমান্স, যেন একদিকে শাশ্বতী নারীর কমনীয়তা অন্যদিকে পুরুষের বিশাল প্রসারতা ও উদার কল্পনার প্রতীক।

প্রতিমা খুব মন দিয়ে শুনছিল এবং মাঝে মাঝে এ-প্রশ্ন ও-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল। শেষ হয়ে গেলে বললে—আমি এ-সব কথা শুনিনি তো কোন দিন—স্কুলে কেউ তো বলে না।

ওরা চলে' গেল। বাইরে গিয়েই প্রতিমা বীণার দিকে চেয়ে নিচুগলায় শাসনের সুরে বলছে কানে গেল—ও-রকম মাস্টার-মশাই মাস্টার-মশাই বলছিলি কেন বীণা? ভারি খারাপ শোনাচ্ছিল কানে—উনি কি আমাদের মাইনে নিয়ে পড়ান?

কয়েকদিন পরে হঠাৎ আমি কলিকাতায় ফেরবার জরুরী তার পেলাম অফিস থেকে। পরদিন সকালে বিছানাপত্র বাঁধা-ছাদা চলছে, বীণা এসে বললে—আপনার আজ যাওয়া হবে না। বেশ তো আপনি, ভরা অমাবস্যা মাথায় বুঝি বাড়ি থেকে বেরুতে আছে? দিদি বলে' দিলে মাস্টার—এই রমেনবাবুকে বারণ করে' আর কাল যাবেন এখন। খুলুন বিছানা—ধরবো?

সেদিন অমাবস্যা কাটবার কথা ছিল না, সুতরাং বিছানাপত্র আবার খুলতে হোল।

পরদিন সকালে এক কাণ্ড ঘটলো। দশটার গাড়িতে আমি যাবো, উকীলবাবুও আমার সঙ্গে যাবেন তাঁর কি কাজে ফরিদপুরে। নারায়ণগঞ্জ থেকে এক স্টীমারেই আমরা যাবো।

সকালে দু'জনে একসঙ্গে ঘরের বারান্দাতে খেতে বসেছি, হঠাৎ উকীলবাবু প্রতিমার ওপর রেগে উঠলেন। আজকের রান্নাবান্নার ভার তারই ওপর বুঝি উকীলবাবু দিয়েছিলেন। সে একটু বেলায় আরম্ভ করিয়েছে ঠাকুরকে দিয়ে, এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে—বিশেষ করে আমি সেখানে একজন-বাইরের লোক—আমার সামনে মেয়েকে এমন রূঢ় ও অপ্রীতিকর কথাবার্তা বললেন, যাতে করে' আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করলাম। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি বলতে লাগলেন—দেখলেন রমেনবাবু, আজকালকার মেয়েদের—আমি ওকে কাল রাত থেকে বলছি, সকালে আমরা যাবো সব যেন ঠিক থাকে—দেখছেন তো একবার কাণ্ডখানা? বলি এটা কি ঝোল না কি ছাই এটা? এর নাম ঝোল? না, আমি সত্যি বলছি রমেনবাবু আমি আজকালকার ও-সব বিবি সাজা পছন্দ করিনে একেবারেই। খুব হয়েছে পড়াশুনোর আর দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে…

আমার সামনে এ-সব কথা হওয়াতে হয়তো নেপথ্যপথবর্তিনী প্রতিমা লজ্জায় অপমানে ভেঙে পড়তে চাইছিল। কেন না আমি সম্পূর্ণ বাইরের লোক। তিরস্কারের পর সে আর আমাদের সামনে পরিবেশন করতে বেরুলো না। অত্যন্ত ভারী মন নিয়ে নিজের ঘরটিতে ফিরে এলাম।

একটু পরেই বীণা চায়ের কাপে এক কাপ দুধ নিয়ে এসে বললে—দুধ-মিছরি খেয়ে নিন্—

—দুধ-মিছরি, কেন বলো দেখি?

—আমাদের বাড়িতে নিয়ম আছে, বাড়ি ছেড়ে কেউ কোথাও যাবার সময় তাঁকে দুধ-মিছরি খেতে দিতে হয়। ওপরের ঘরে বাবাকে দিয়ে এলাম। দিদি বলে' দিলে—রমেন-বাবুকেও দিয়ে আয় বাইরের ঘরে…

গত তিন দিন প্রতিমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। আজ এই মাত্র এই যা খাবার সময় দেখা হয়েছিল, তাও অতি অল্পক্ষণের জন্যে। যাবার সময়ও দেখা হোল না—শুধু বীণা বিছানাপত্র গাড়িতে ওঠাবার সময় কাছে কাছে ছিল। আমার মনে কয়েকদিন ধরে' একটা সন্দেহ হয়েছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—। বীণা, আচ্ছা একটা কথা বলি, তোমার মাকে তো দেখতে পাইনি কোনোদিন। তিনি…

—আমার মা এক মাস হোল মামার বাড়ি গিয়েছেন ছোটমামার বিয়েতে—এই বুধবার আসবেন। আর দিদির মা নেই, দিদির ছেলেবেলাতেই…

—প্রতিমা তোমার আপন বোন না?

বীণা ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—বা রে, অ্যাদ্দিন আছেন, তাও জানেন না বুঝি? আপনার মন থাকে কোথায়? একদিন তো আপনার সামনে এ কথা হয়ে গিয়েছে না?

কবে পূর্বে একথা উত্থাপিত হয়েছিল, মনে না হোলেও এতদিনের একটা খটকা আমার কাছে আজ পরিষ্কার হয়ে গেল। তাই বীণা ও প্রতিমার মুখের গড়নে এতখানি তফাত! কথাটা অনেক বার মনে হোলেও ঠিক কিছু ধারণা করতে পারিনি এত দিন।

অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে উকীলবাবুর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে উঠে বসলাম। আজ কয়দিনের তো জানাশোনা—কিন্তু চলে' যাবার সময় মনে হতে লাগলো, প্রথম এসে এই অপরিচিত লোহার গেটের মধ্যে যখন আমার ঠিকাগাড়ি ঢুকেছিল, সেদিন আজ অনেকদূর পেছনে পড়ে গিয়েছে—আজ এই বাড়ির প্রতি জিনিসটা, ঐ পাতা-বাহারের গাছটা, বাইরের উঠানের ঐ পুরানো ইঁদারাটা, সব যেন হঠাৎ বড় প্রিয় হয়ে উঠেছে—যেন নীড়-হারা বিহঙ্গ নিঃসীম শূন্যে মুক্তপক্ষে উড়তে উড়তে কোথায় নীড়ের সন্ধান পেয়েছিল, যে নীড়ে তার কোন দাবীদাওয়া নেই, শুধু মনের মধ্যেকার একটা অনির্দিষ্ট নির্ভরতার ভাবে সেই মিথ্যা অধিকারের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিত মাত্র। তাই আজ ছেড়ে যাবার বাস্তবতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে তার নিজের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে সে অধিকারের বার্তাটা কতটা অসঙ্গত ও ভিত্তিশূন্য।

দেশে ফিরে অল্প কিছুদিন বাড়ি থাকবার পরেই কয়েক মাস একরকম কেটে গেল। পূজার পরে কার্তিক মাসের প্রথমে হঠাৎ অফিসের হুকুম হোল আবার ঢাকা যাবার।

এবার যখন গোয়ালন্দ থেকে স্টীমারে উঠলাম তখন আগেকার মত ভিড় ছিল না। পদ্মা-বক্ষ শান্ত স্থির—চরে চরে কাশের বন ঘন সবুজ, আকাশের রঙ তিসির ফুলের মত নীল। নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ভারী আরামে কাটলো।

ঢাকায় নেমে কিন্তু বীণাদের ওখানে না গিয়ে ডাক-বাংলোয় উঠলাম।

নানা কারণে এবার বীণাদের বাড়ি উঠতে পারা গেল না। বার বার অনাহূত ভাবে তাদের ওখানে গিয়ে উঠলে তারাই বা কি মনে করবে? হয়তো এবার আমার সেখানে যাওয়াটা তারা পছন্দ নাও করতে পারে। তার চেয়ে বরং নিজের কাজকর্ম সেরে এমনি একদিন তাদের বাড়িতে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখাশুনো করে' আসা যাবে এখন।

আবার জ্যোৎস্না-পক্ষ ঘুরে এল। ডাক-বাংলোর কম্পাউণ্ডের হাস্না ঝোপের মিঠা মৃদু সৌরভ-ভরা ঝিরঝিরে বাতাসে বারান্দার রেলিঙ-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কথাই মনে ওঠে। একবার মনে হচ্ছিল, এই অপরিচিত ঢাকা শহরটিতে এমন কেউ আমার আপনার জন আছে যে, যদি সে জানে আমি ঢাকাতে এসেছি এবং লক্ষ্মীছাড়ার মতো ডাক-বাংলোয় উঠে দাড়িওয়ালা বাবুর্চির শিরাবহুল হস্তের ডালভাত ও সুরুয়া আহার করছি তো মনে মনে ভারী দুঃখিত হবে। কারণ আমি জানি আমার আহারের কিছুমাত্র অনিয়ম হোলে তার সহ্য হয় নি, নানা অনুযোগ করে' ঠিক সময়ে খেতে বাধ্য করেছে, কিসে আমার স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে তার জন্যে অলক্ষ্যে কত চেষ্টা ছিল তার। এক একবার মনে হচ্ছিল, এসব চিন্তার সার্থকতা কি? অতিথির প্রতি সৌজন্যকে অন্য কিছু বলে মনে করবার অধিকারই বা আমায় কে দিয়েছে?

দিন পনেরো ঢাকায় কেটে গেলেও বীণাদের বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত মাড়ালাম না ইচ্ছে করেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু "ভারতমাতা ব্যাঙ্কের" শেয়ার বিক্রি এবং কালু-ঝমঝম্ ভোপের

পুরাতত্ত্ব আলোচনা করে সময় কাটানো অসম্ভব ও একঘেয়ে হয়ে উঠলো। একদিন বিকেলের দিকে ওদের বাড়িতে ছড়ি হাতে নিশ্চিন্তমনে বেড়াতে গেলাম—যেন এই পথ দিয়েই কাজের খাতিরে যেতে যেতে একবার দেখতে আসা গেল কে কেমন আছে। গেটের মধ্যে ঢুকে চোখ পড়লো বাড়ির ওপরের ঘরে সব জানালা বন্ধ। উকীলবাবুর অফিস-ঘরের সামনে রামধনিয়া বেয়ারাও টুলের ওপর বসে নেই, বাইরে কোথাও একটা···কি করা যায় বা কাকে ডাকবো ভাবছি এমন সময় উকীলবাবুর পুরানো খানসামা ছকু বাজার থেকে কি কিনে নিয়ে গেট দিয়ে বাড়ি ঢুকেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—বাবু আপনি ?

—হ্যাঁ, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই। বাবু কোথায় ?

—আপনি শোনেন নি, জানেন না কিছু ?

পরে সে একে একে যা বলে' গেল তা সংক্ষেপে এই যে, গত ভাদ্রমাসে উকীলবাবু রক্তাধিক্য রোগে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান। তার ওপর বিপদ—বড় দিদিমণি পরীক্ষায় ফেল হন এবং তারপরই তাঁর মাথা খারাপ মত হয়ে গিয়েছে—তিনি আছেন তাঁর মামার বাড়ি। বীণাকে নিয়ে তাঁর মা নিজের বাপের বাড়ি চ'লে গিয়েছেন এবং সেইখানেই আছেন। বর্তমানে এ-বাড়িতে রঘু মিশির দারোয়ান আর সে ছাড়া আর কেউ থাকে না, অন্য চাকর-বাকরের জবাব হয়ে গিয়েছে।

ডাক-বাংলোয় ফিরে সেদিন কোনো কাজে মন গেল না। প্রতিমার কথা ভেবে আমার মন করুণায় পূর্ণ হয়ে গেল। ডাকবাংলোর নির্জন বারান্দার অন্ধকারটাও যেন অশ্রুসজল হয়ে উঠলো ওর নানা ছোটখাট কথাবার্তার স্মৃতিতে ;···পরদিন সকালে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির কাজটা যে পরিমাণে হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। সকাল-সন্ধ্যায় সব সময় মহা উৎসাহে ঘুরে ঘুরে অফিসের কাজ করে বেড়াই আর কলকাতার অফিসে বড় বড় রিপোর্ট পাঠাই।

দিন পাঁচেক পরে সেদিন সকালে স্নান করে বসে খবরের কাগজ পড়ছি এমন সময় ডাক-বাংলোর বেয়ারা বললে—আপ্‌কো পাস এক আদমি আনে মাংতা হ্যায়···

একটু পরেই দেখি উকীলবাবুর বাসার ছকু খানসামা বেয়ারার সঙ্গে ঘরে ঢুকছে। আমি আগ্রহের সুরে বললাম—কি মনে করে' ?

ছকু বললে—পরশু ছোটদিদিমণি বাড়ি এসেছেন মার সঙ্গে। আপনি সেদিন বাসায় গিয়েছিলেন শুনে আমায় বলে দিলেন, ডাকবাংলোয় গিয়ে দেখে আয় তিনি আছেন কিনা, থাকলে আমাদের বাড়ি অবশ্যি করে' একবার আসতে বলে' আয় আমার নাম করে'—আজই বিকেলে যেতে বলে দিয়েছেন।

আমি তাকে বলে' দিলাম, অফিসের কাজ সেরে বিকেলের দিকে আমি নিশ্চয়ই যাবো।

বিকেলে যখন বীণাদের বাড়ি গেলাম তখন সন্ধ্যা হবার খুব বেশি দেরি ছিল না। রাস্তার ধারে ধারে আলো দিয়েছে, মোড়ে মোড়ে ফিরিওয়ালা 'চাই গরম গরম বাখর খানি' বলে

হেঁকে যাচ্ছে। ওদের বাড়ি পৌঁছে বাড়ির মধ্যে খবর পাঠালাম। একটু পরে বীণা এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার শরীর ভালো আছে?

—এক রকম মন্দ নয়। তোমার—তোমাদের সব?

বীণার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে' জল ঝরে পড়লো। কথাটা জিজ্ঞাসা না করাই বোধ হয় উচিত ছিল। সান্ত্বনাসূচক গোটাকতক মামুলি কথা বলে আনাড়ির মতো বসে রইলাম। কিন্তু ঐ জন্যেই আমি বীণাকে ভারী পছন্দ করি—এত অল্পক্ষণের মধ্যে সে নিজের দুর্বলতাটুকু সামলে নিলে যে তাকে আমি মনে মনে সাধারণ মেয়েদের চেয়ে উচ্চ আসনে স্থান না দিয়ে পারলাম না।

চোখ মুছে নিয়ে বললে—আপনি এসে উঠেছেন কোথায়? ডাকবাংলোয়? আচ্ছা এইবার তো আমরা এসেছি, জিনিসপত্র নিয়ে এখানে চলে আসুন কাল সকালেই···

বীণা কথাটা এমন হুকুমের সুরে বললে যে হঠাৎ তার প্রতিবাদ করা সম্ভবপর নয়। অন্য কথা তুলে সেটা চাপা দেবার ভাবে নানা অপ্রাসঙ্গিক কথা ওঠালাম, যেন প্রধানতঃ সেই-গুলো জানবার আগ্রহেই আমি এতটা পথ হেঁটে এসেছি; শেষে বললাম—প্রতিমা কোথায়? এ প্রশ্নটা অনেকবার মুখে এলেও এতক্ষণের মধ্যে কি জানি কেন একবারও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারি নি।

বীণা বললে—দিদি এখনও সারে নি। বড় মামাবাবু সঙ্গে করে চুনার নিয়ে গেছেন সেইখানেই আছে। কেবল আপন মনে বসে' বসে' কি ভাবে এ ছাড়া তার আর কোনো খারাপ লক্ষণ নেই। কিন্তু খায় না দায় না, শুতেও চায় না, বেড়াতে যেতেও চায় না, কেবল রাত দিন বসে' বসে, ভাবছে—ঐ তার রোগ ··

—পরীক্ষায় পাস না করেই বোধহয় এমন হয়ে···

বীণা বললে—শুধু পরীক্ষায় পাস নয়, সে অনেক কথা। আপনাকে বলতে আর কি আপনি ঘরের লোক। দিদি পরীক্ষা দেওয়ার পর বাবা তার এক সম্বন্ধ ঠিক করলেন। চাঁট-গাঁয়ের উকীল, হাতে পয়সা আছে, কিন্তু ভেজপক্ষের বর, বয়স চল্লিশেরও ওপর। দিদি সব শুনেছিল, কিন্তু কিছু বলেনি। মা কত বোঝালেন কিন্তু বাবার ইদানীং কেমন হয়েছিল জানিনে, দিদিকে একেবারে যেন বিষ নজরে দেখতেন। দিদি শেষে রাগে পড়ে' খবরের কাগজ দেখে কোথাকার স্কুলে মাস্টারীর দরখাস্ত করে, চাকরি পায়ও—কিন্তু বাবার হাতে তাঁদের চিঠি এসে পড়ে। তারপর সে কী অপমান আর কী কাণ্ড! তারপরই পরীক্ষার ফেল হোল, সে আবার এক কাণ্ড। বাবা হঠাৎ মারা না গেলে এ-বিয়ে ঠিক হোত। এইসব গোলমালে দিদি যেন কেমন হয়ে গেল। চিরকাল সে ভারী অভিমানী। দিদির কোন দোষ ছিল না, সে যে মাস্টারীর দরখাস্ত করেছিল সে শুধু অপমানের জ্বালায় জলে জলে আর থাকতে না পেরে।

তারপর বীণা আমায় বসতে বলে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে চলে' গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পুরানো দিনের মতো নিজের হাতে চা ও ঝি-এর হাতে জল খাবারের রেকাবি আর জলের

গ্লাস নিয়ে ঘরের টেবিলে রেখে বললে—আসুন দিকি, খেয়ে দেখুন তো চা'টা—তবে কি আর আপনার ডাক-বাংলোর বাবুর্চির মত হয়েছে ?

বীণা আগেকার চেয়েও সুশ্রী ও মাথায় বড় হয়ে উঠেছে। তবে ওর ধরনগুলো ঠিক আছে. একটুও বদলায়নি। বেশ লাগে ওকে।

ওঠবার সময় বীণা বললে—কিন্তু আপনি কাল সকালেই আসবেন তো? আমি মাকে বলেছি, আপনি না এলে ভারী রাগ করবো কিন্তু বলে' দিচ্ছি। কাল রঘু মিশিরকে সকালে ডাক-বাংলোয় পাঠিয়ে দেব এখন।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম—এবারকার অফিসের কাজ শেষ হয়ে এসেছে, বেশীদিন আর চাকায় থাকতে হবে না, অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতায় যেতে হবে। বরং এর পর যখন আসবো—ইত্যাদি। বীণা কিন্তু কিছুতেই শুনলে না, তার মনেও বেশী কষ্ট দিতে পারলাম না, রাজী হয়ে বললাম—আচ্ছা তাই হবে, তবে একটু দেরী হয়ে যাবে হয়তো, এই বেলা ন'টার মধ্যেই আসবো। বীণা খুব খুশী হয়ে বললে—আপনার সেই ঘরটাতেই থাকবেন, সকালেই আটটার আগে আমি রঘু মিশিরকে পাঠাবো। চলে' আসবার সময় আবার ডেকে বললে—সকালে চা খেয়ে আসবেন না যেন, এখানে এসে খাবেন···

ডাক-বাংলোয় ফেরবার পথে সেদিন একটা সত্য আমার কাছে বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো—হঠাৎ বীণারা আমার বড় আপন উঠেছে। এত অল্পদিনে যে উপকরণে গাঁথুনী পাকা ও শক্ত হয়ে ওঠে, ওদের দিক থেকে অন্ততঃ তার কোনো কার্পণ্য তো ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের এরকম সহজ সম্পর্ক আদান-প্রদান যে জীবনের কত বড় সম্পদ তা অনেক স্থলে আমরা বুঝিনে বলেই সকল সম্বন্ধকে ছোট করে' দেখতে শিখি। মেয়েরা এটা কেমন সুন্দর-ভাবে পারে, ওদের চরিত্রগত সেবা-প্রবৃত্তি ও মুগ্ধ মনের সৌন্দর্য জগৎকে যে কত দিক থেকে মঙ্গল ও কল্যাণে ভরে' রেখেছে তার বাস্তবতা সেদিন নির্জন ডাক-বাংলোর বারান্দাতে বসে' মনে-প্রাণে অনুভব করলাম।

সব কথা বুঝিয়ে বলা যায় না। শুধু নক্ষত্রদল যখন অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে কাঁপে · রাত্রি অপূর্ব রহস্যময় হয় ··নৈশ পাখীর ডাক দূর থেকে ভেসে আসে···মনের মধ্যের নাম-না-জানা উল্লাসে সে সত্যটুকু নিজের কাছে নিজে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।···

ডাক-বাংলোয় ফিরে দেখি আমার এক পুরানো বন্ধু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি ইণ্ডিগোরেন্সের দালাল, নারায়ণগঞ্জে কাজে এসেছেন এবং সেখানেই আছেন। তাঁর নামে তাঁর একটা মণিঅর্ডার এসেছে কিন্তু সেখানকার পোস্টমাস্টার তাঁকে চেনেন না, তাঁকে সনাক্ত করবারও কেউ সেখানে নেই বলে' টাকা দিচ্ছেন না ; এদিকে তাঁর হাতেও এক পয়সা নেই—এখন কি করা যায় ?

খুব ভোরের ট্রেনে বন্ধুকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জে রওনা হলাম। যাবার সময় চৌকিদারকে বলে' গেলাম কেউ এসে খোঁজ করলে বলতে যে জরুরী কাজে নারায়ণগঞ্জে চলে' গিয়েছি আজই ফিরবো। নারায়ণগঞ্জে কাটলো দিন দুই। মহা হাঙ্গামা। পোস্টমাস্টার আমাকেও

চেনেন না, টাকাও কিছুতেই পাওয়া যায় না। দু' একজন যাদের সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল তাঁরা টাকাকড়ির হাঙ্গামা শুনে পেছিয়ে গেলেন। অনেক কষ্টে শেষে কাজ মিটলো। ডাক-বাংলোয় ফিরেই অফিসের চিঠি পেলাম বিশেষ দরকারে কুমিল্লা যেতে হবে। চিঠি এসে দু'দিন পড়ে আছে, আগেই যাওয়া উচিত ছিল, বিলম্বে কার্যক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। ডাক-বাংলোর চাপরাশি বললে রঘু মিশির দু'দিন এসে ফিরে গিয়েছে। এদিকে ট্রেনের সময় সংক্ষেপ, ফেরবার পথেই বীণার সঙ্গে দেখা করা ঠিক করলাম।

কুমিল্লা থেকে যেতে হোল চাটগাঁ, সেখান থেকে স্টীমারে বরিশাল, সেখান থেকে কলকাতা। তারপরেই ফাল্গুন মাসে আমার ছোট বোনের বিবাহ উপলক্ষে একমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি। ছোট বোনের বিবাহ শেষ হয়ে যাবার অল্পদিন পরেই মা পড়লেন অসুখে এবং মাসখানেক ভোগবার পর চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সেরে উঠলেন, কিন্তু চেঞ্জে যাওয়ার দরকার হোল। অফিসে আরও একমাস ছুটির দরখাস্ত করাতে তারা ছুটি তো দিলেই না বরং লিখলে, শীঘ্র কাজে যোগ না দিলে অন্য লোক বাহাল করবে। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এক লম্বা পত্র লিখলাম সেখানে।

তাই এতদিন পরে ভেবে দেখি জীবনের গতি অপূর্ব, অদ্ভুত। এর চেয়ে বড় রোমাঞ্চের সন্ধান কেউ দিতে পারে না। বীণাকে যখন বলে আসি পরদিন সকালে তার ওখানে যাবো —এমন কি তার মন প্রফুল্ল রাখবার জন্যে তাকে কি সব বই পড়াবো তা পর্যন্ত ভাবতে ভাবতে এসেছিলাম—তখন কে জানতো বীণার সঙ্গে দেখা তো আর হবেই না, আমার ঢাকা যাওয়ার পথই একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেল। আইন পাস করে আলিপুর কোর্টে বেরুতে আরম্ভ করলাম। ভবঘুরের জীবন ক্রমে পেছনে পড়ে গেল। মাত্র নির্জন অবসর-মুহূর্তে, বার-লাইব্রেরী কক্ষের মক্কেলহীন দুপুর বেলায়, মাঝে মাঝে সে-সব দিনের নানা কথা মনে পড়ে—তখন যেন স্বপ্নের মত ঠেকে।···

এই সব স্মৃতিতেই জীবন মধুময় হয়ে ওঠে, জীবনের কুঞ্জবনে এরাই গায়ক-পাখী, ফুল-ফলে সকাল দুপুরের সঙ্গে সুর-মেলানো অনন্তমুখী সঙ্গীত এদেরই নিভৃত নীড়ান্তরাল থেকে শোনা যায়।

বিবাহের অনুরোধে বাড়িতে তিষ্ঠানো দায়। জ্যাঠামশায় ভবানীপুরে কোথায় বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে পাত্রী দেখে এসে খুব প্রশংসা করলেন। জ্যাঠাইমার অনুরোধে তাঁদের বাসা থেকে রওনা হয়ে বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে একদিন মেয়ে দেখতে গেলাম।

বেলতলা রোডে একতলা ছোট বাড়ি। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটু কম্পাউণ্ড, গেটের ওপরকার লোহার জালতিতে থোকা থোকা মাধবীলতার গুচ্ছ। আমরা গিয়ে বৈঠকখানায় বসবার অল্পক্ষণ পরেই মেয়েকে আনা হোল। তার মুখের দিকে চেয়েই আমি চমকে উঠলাম। বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হোল না।

বীণা।···

কিন্তু এ কোন্ বীণা? চার বছর আগে সে চঞ্চলা বালিকা নয়, অনিন্দ্যসুন্দরী, ধীরা সংযতা তরুণী! মেয়ের মামা পরিচয় দিলেন মেয়েটি বেথুনে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে, পড়াশুনায় বেশ ভাল; বাপ ঢাকার উকিল ছিলেন, মারা গিয়েছেন। বীণা চোখ নিচু করেছিল, আমার দিকে চায় নি—সে বোধ হয় জানেও না যে আমিই পাত্র।

বাড়ির বার হয়ে এসে বন্ধুরা আমাকে ভাগ্যবান বললেন। ও-রকম পাত্রী অদৃষ্টে জোটা ইত্যাদি।

কাউকে কোন কথা বললাম না।

শুভদৃষ্টির সময় কাপড় ঢাকা দিয়ে দেওয়া হোল না, এমনই দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে দেখলাম—বীণার মুখের অবস্থা ফটোগ্রাফ নেবার যোগ্য হয়েছিল।

অনেক রাত্রে বাসরে সে শাসনের সুরে বললে—আপনি তো আচ্ছা? তলে তলে বুঝি এই সব কু-মতলব ছিল?

আমি উত্তর দিলাম—আমি বুঝি জানি? মেয়ে দেখবার দিন তো আমি জানলাম। আগে জানতে পারলে তুমি বোধ হয় এতে রাজী হতে না—না?

বীণা রাগে ঘাড় দুলিয়ে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলে। আমার দিকে না চেয়েই বললে—কোথায় ছিলেন এতদিন নিরুদ্দেশ হয়ে? আর এলেন না কেন সেবার?

সংক্ষেপে কৈফিয়ত দেবার পর আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম—প্রতিমাকে দেখছি না, সে কি এখানে আসে নি আজ?

এবার বীণা আমার মুখের দিকে চাইলে, চেয়ে চুপ করে রইলো। তারপর সংযত সুরে বললে—জানেন না? দিদি নেই—সেবারই মাঘ মাসে মারা যায়। মাথা তার ভাল হয় নি। আপনার নাম বড় করতো, আমার কাছে, কতদিন বলেছে।

রাক্ষস-গণ

বিপত্নীক হবার অল্পদিন পরেই সুরেশ সলিমপুর স্টেশনে বদলী হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে ছোট্ট স্টেশন, নিকটে লোকজনের বাস খুবই কম। রেলের কোয়ার্টারে বড়বাবু পুত্র-পরিবার নিয়ে বাস করেন। কিছু দূরে একটা ছাত্রবৃত্তি স্কুল আছে—তার শিক্ষকগণ স্কুলের নিকটেই একটা বড় আটচালা ঘরে মেস করে থাকেন। এ ছাড়া বড়-একটা বসতি নেই।

বিকেলের ট্রেনখানা রওনা করে দিয়েই সুরেশ স্কুল-মাস্টারের মেসের বাসায় তাস খেলার আড্ডায় যায়। সন্ধ্যা সাতটার সময় ডাউন-যাত্রী-গাড়ি আসবার পূর্ব পর্যন্ত সেইখানেই থাকে। পরে খানিকক্ষণ স্টেশনের কাজকর্ম করবার পর রাত্রি সাড়ে ন'টার শেষ গাড়ি রওনা করেই নিজের কোয়ার্টারে ছোট্ট ঘরটিতে ফিরে এসে ও-বেলার রাখা বাসি রুটি-তরকারী খাওয়ার

পরে সারাদিনের কর্মক্লান্ত শরীরটাকে নিঃসঙ্গ শয্যায় লুটিয়ে দিয়ে আপন মনে কত কথা ভাবে। ব্র্যাঞ্চ লাইনের স্টেশন, রাত্রে আর ট্রেন নেই।…

জানালার বাইরে খোলা আকাশটা নক্ষত্রভরা, একটা মাদার গাছের ডাল-পালা গরাদের গায়ে এসে ঠেকেছে। মনে পড়ে মৃত্যুর পূর্বে নলিনী তার হাত নিজের দু'খানি রোগজীর্ণ দুর্বল হাতের মধ্যে নিয়ে হাসিমুখে বলেছিল—আমার একটা কথা রাখবে লক্ষ্মীটি, ফের বিয়ে কোরো। কথা রাখবে ঠিক, বলো?

সে নলিনীর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলেছিল—ছিঃ, ও-সব কথা কি বলতে আছে? তুমি সেরে উঠবে; ডাক্তারবাবু তো বলেছেন, পূর্ণিমাটা কেটে গেলেই পথ্যি দেবেন। ও-রকম কথা আর তুলো না, মা ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করবেন—ছিঃ…

সে পূর্ণিমা কাটে নি।

কর্মভারনত নিরানন্দ প্রবাসের দিনগুলিতে নলিনীর এই স্মৃতিই মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুরেশের অন্যমনস্ক মুহূর্তগুলি মধুর রসে ভরিয়ে তোলে, নিশীথে ফোটা রজনীগন্ধার মিঠা মৃদু সুবাসের মত—বিশেষ করে এইসব রাত্রে যখন সে একা।…

মাঘ মাসের সকাল বেলা। এই মাত্র স্টেশন থেকে এসে রাঁধতে বসেছে, একটি বারো তেরো বছরের অপরিচিতা মেয়ে একখানা থালা হাতে ঘরে ঢুকে লাজুক সুরে বললে—মা পাঠিয়ে দিলেন।…থালাতে ছয়-সাতটি বাটিতে নানা তরকারী।

সুরেশ হঠাৎ বড় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, কি করা উচিত ঠিক করতে না পেরে তাড়াতাড়ি তরকারী বাটি থেকে তরকারী নামিয়ে সেগুলো খালি করে দেবার চেষ্টায় এতটা অনর্থক ব্যস্ততার আমদানি করে বসলো যে মেয়েটি মৃদু হেসে বললে—বাটি এখন থাক, রেখে দিন আপনি, ঝি এসে নিয়ে যাবে এখন।

শুধু থালাখানা উঠিয়ে নিয়ে সে চলে গেল। সুরেশ ভাবলে, বড়বাবুর বাসা থেকে এসেছে বটে কিন্তু বড়বাবুর নিজের মেয়ে নয় সে জানে। এতদিন এ মেয়েটিকে কখনো দেখেও নি তো?

বেশ শান্ত মুখখানি।

মাসখানেক কেটে গেল। ব্র্যাঞ্চ লাইনের স্টেশনে ছোটবাবুর জীবন সকাল-সন্ধ্যা একঘেয়ে একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন ভাবে কেটে চলেছে। সেই মেয়েটি আরও কয়েকবার নানা কাজে সুরেশের বাসায় যাতায়াত করেছে; মেয়েটি বড়বাবুর ভাগিনেয়ী—মা নেই, বাপ পঞ্চার ও-পারে কোন্ এক স্টেশনে চাকুরি করেন, সম্প্রতি মামার বাড়ি এসেছে বেড়াতে, মামী-মাকেই মা বলে ডাকে—এ সব খবর সুরেশ ক্রমে জানতে পারে।

একদিন কি কাজে মেয়েটি এল। সুরেশ কথায় কথায় বললে—রেণু, পানগুলো আজ কদ্দিন ধরে পড়ে রয়েছে, সাজা অভাবে খাওয়া হয় না। গোটাকতক সেজে রেখে যাবে?

রেণু অমনি পান সাজতে বসে গেল। নিপুণ হাতে এক রাশ পান সাজা শেষ করে সে ভাগিদ দিয়ে কলঙ্ক-ধরা অপরিষ্কার কাঁসার ডিবেটা সুরেশের বাক্সের কোণ থেকে বার করে

নিয়ে সেটা খানিকক্ষণ বসে বসে বালি দিয়ে মেজে ঝক্‌ঝকে করে তুললো। বিছানার ধারে পানে ভর্তি ডিবেটা রেখে দিয়ে হাসিমুখে বললে—দু'আনা পয়সা দিন আমাকে...

সুরেশ বুঝতে না পেরে বললে—কেন বলো তো?

—বৌ মারা গিয়ে সন্নিসী হয়েছেন বুঝি? না মশলা, না একটু এলাচ দারচিনি। শুধু ধনের-চাল দিয়ে পান সাজা—পয়সা দিন, আমি ভজুয়া পয়েণ্টসম্যানকে দিয়ে আনিয়ে রাখবো বাজার থেকে...

এক এক দিন তার কোটটার পকেট থেকে ময়লা রুমালখানা বালিশের তোয়ালেখানাকে সাবান দিয়ে ধুয়ে রৌদ্রে দড়ির টানায় মেলে দিয়ে চলে গিয়েছে, ট্রেন পাস করে বাসায় ফিরে এসে সে দেখতে পায়। তারপর উপরি উপরি দিন কয়েক সে অদৃশ্য সেবা-হস্তের সন্ধান পাওয়া যায় না, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন চোখে পড়ে ঘরের তক্তপোশের নিচে তার ছোট পাথর-বাটিতে এক বাটি বেলের শরবৎ কে সযত্নে ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছে।

স্কুল-মাস্টারদের মেসের বাসায় তাস খেলার ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। টিকিট-বিক্রির জানালায় পয়সা গুণে দিতে দিতে ভুল হয়, নির্জন শয্যা প্রান্তের সাথী মাদার গাছটার অন্ধকার ডালপালার সীমারেখা আরও অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব মনে হয়।...

ঝি পাঁচীর-মা সেদিন অত্যন্ত বেলায় কাজ করতে এল। কৈফিয়তের সুরে বললে—একটু বেলা হয়ে গেল বাবু, এই দুপুরের গাড়িতেই রেণু দিদি আবার চলে যাবে কিনা তাই সকাল সকাল বড়বাবুদের পাট সেরে তবে আসছি।...

সুরেশ যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—রেণু? আজ চলে' যাবে? কই তা তো... কেন আজ কেন? আমি তো কিছুই জানিনে...

কথাটা বলেই সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে' রইলো। পরের বাড়ির মেয়ে, তার সঙ্গে তো পরামর্শ ক'রে মেয়েটির যাতায়াত ধার্য হবে না। যায় যাক না—তার কি?

পাঁচীর-মা বললে—নিজের বাপের কাছে চলে যাবে। বাপ সেখানে বিয়ের সম্বন্ধ করেছে কিনা তাই মেয়ে দেখতে আসবে। গেলেই বাঁচে, যে মামী—খাটিয়ে খাটিয়ে মুখে রক্ত উঠিয়ে মারে, না একটু যত্ন—না একটু আত্তি ..

বারোটার ডাউন ট্রেন আসবার বেশী দেরী নেই। সুরেশ এই মাত্র খেয়ে উঠে পান মুখে দিয়ে কোট পরছে, রেণু বাসার সদর দরজা পার হয়ে উঠানে এসে ঢুকলো। একটু যেন ইতঃস্তত করে পরে ঘরে ঢুকে বললে—আমার একটা সেপ্‌টি-পিন সেদিন কি এখানে ফেলে গিয়েছি?

সুন্দর করে চুল-বাঁধা, পরেন খয়েরী রঙ-এর জমির ওপর গ্রেন জরির কাজ করা ছেলে-মানুষের মতো শাড়ি, গলায় সরু চেনহার, একরাশ ঘন কৃষ্ণ চুলে ভরা শান্ত মুখ!

সুরেশ বললে—তুমি আজ চলে যাবে রেণু? কই সে কথা তো জানিনে? এই বারোটার গাড়িতেই বুঝি?

রেণু এ-কোণে ও-কোণে কি খুঁজছিল। বললে—আবার এই কাঁচের গেলাসটা সোজা

করে বসিয়ে রেখেছেন ? একটা ভেঙেছেন যে এমনি করে সেদিন হ্যাঁ, আমি তো এই গাড়িতেই যাবো···একটা সেফ্‌টি-পিন দেখেছেন কোথাও ?···কোন্ প্রশ্নটির উত্তর সুরেশ আগে দেবে ভেবে ঠিক করবার আগেই রেণু বলে উঠলো—নাঃ, সে পাওয়া যাবে না। আচ্ছা আমি যাই, গাড়ি এল বলে···

কথা শেষ করেই হঠাৎ সে সুরেশের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে প্রণাম করে উঠে শান্ত নত মুখে সদর দরজা পার হয়ে চলে গেল।

পূর্বেও ঘরে কেউ ছিল না, এখনও কেউ নেই—তবুও সন্ধ্যার ট্রেনখানা পাস করে দিয়ে বাসায় ফিরে এসে সুরেশের মনে হোল—সব খালি, কেউ কোথাও নেই, ঘরের আসবাব-পত্র শূন্যতায় ভরা !···

মাসখানেক পরে বড়বাবু সুরেশের কাছে এক অভাবনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করলেন। সে তাঁর ভগ্নিপতির শ্বশুর, বিশেষতঃ রেণু মেয়েটিকে সে অবশ্যই দেখেছে, সংক্ষেপে রেণুর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব।

প্রথমে সুরেশের কথাটা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হোল না, পরে সে চুপ করে রইলো। বড়বাবু প্রবীণ ব্যক্তি, সুরেশের বয়স সবে তেইশ, সুতরাং বড়বাবু সুরেশের সঙ্গে এ-বিষয়ে এর বেশি আর কোন কথাবার্তার আবশ্যক দেখলেন না। তার কাছে ঠিকানা জেনে নিয়ে তার জ্যাঠামশায়কে পত্র দিলেন। বিবাহের যোগাযোগ ও অন্যান্য কথাবার্তা চলতে লাগলো। ইতিমধ্যে সুরেশের জ্যাঠামশায় রেণুর বাপের কর্মস্থানে পাত্রী দেখে এসে সুরেশকে ও বড়-বাবুকে জানালেন—পাত্র সুন্দরী, তাঁদের খুব পছন্দ হয়েছে। সামনের মাসেই শুভকাজ সম্পন্ন হয় এই তাঁর ইচ্ছা।

শীঘ্রই কিন্তু একটু গোল বেধে গেল। উভয়ের ঠিকুজী কোষ্ঠী মেলাতে গিয়ে দেখা গেল মেয়ের রাক্ষস-গণ। মিলনের বহু বাধা, নক্ষত্রেরা সব তির্যগ-গতিতে অবস্থান করছেন—বিবাহ অসম্ভব। সুরেশের বিধবা মা কেঁদে বললেন—তাঁর ছেলের নর-গণ, তিনি কখনই এ পাত্রীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন না। জ্যাঠামশায়ও সম্মতি দিতে পারলেন না, তবে খুব দুঃখিত হলেন, কারণ মেয়েটিকে তাঁর ভারী ভাল লেগেছিল।

সুরেশ বাড়িতে চিঠিপত্র দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলে। তবে তার স্বগ্রামস্থ কোন বন্ধুকে লিখিত পত্রের সংবাদে বাড়ির সকলে জানতে পারলে যে সে শীঘ্রই গেরুয়া ধারণ করে রামকৃষ্ণ-মঠে যোগ দেবে। সুরেশের মা দেশ থেকে রেলের বাসায় এসে পড়লেন। নানা মতে বোঝালেন, কান্নাকাটিও কম করলেন না। পাচীর-মার মুখে রেণু ও সুরেশের পূর্ব পরিচয়ের সব কথা শুনে বললেন—কোথাকার এক রাক্ষুসি সে আমার ছেলেকে ফাঁদ পেতে ধরতে এসেছিল। তোর বিয়ে না হয় এমনি বেঁচে থাক। দরকার নেই আমার ছেলের বউয়ের সেবার—ইত্যাদি।

বিবাহ হোল না। বিবাহ ভাঙবার পর থেকে বড়বাবুর বাসার সঙ্গে সুরেশের সদ্ভাবও আর তেমন রইলো না। বড়বাবু আর ভাল করে কথাই বলেন না।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে সুরেশের অন্যত্র বিবাহ হয়ে গেল। অবস্থাপন্ন ঘরের সুন্দরী মেয়ে, নাম আভাবতী। বেশ নম্র লাজুক।

সুরেশ বিবাহের অল্পদিন পরেই নব বধূকে রেলের বাসায় নিয়ে এল। মাদার গাছের তলাকার ছোট্ট বাসাটিতে, তারপর তারা দু'জনে যে সুখের নীড় বাঁধলো সুরেশের তা কত সীমাহীন নির্জন রাত্রির স্বপ্ন!···শেষ পর্যন্ত সুরেশের মনে হোল—ভালই হয়েছে সে বিয়েটা না হয়ে, গণকের কথা একেবারে উড়িয়ে দেবার জিনিস তো আর নয়? ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। ইতিমধ্যে আরো দুটো খবর সে পেয়েছে—রেণুর বিবাহ কোনো রকমে হয়ে গিয়েছে এবং বিবাহের কিছুদিন পরেই রেণুর বাপ কলেরায় মারা গিয়েছেন।

আরও এক বছর কাটলো। আভাবতী শুধু যে দেখতে সুন্দরী তা নয়, তার আয়-পয়ও যে খুব ভাল তার প্রমাণও শীঘ্র উপস্থিত হোল। সুরেশ বিখ্যাত পাটের ব্যবসায়ের গঞ্জ রসুলপুর স্টেশনের অস্থায়ী চার্জ পেয়ে বদলির হুকুম তালিম করবার জন্যে প্রস্তুত হোল, মাইনেও গেল বেড়ে।

যাবার দিন ক্রমেই নিকটে এসে গেল। স্কুল-মাস্টারেরা মেসের বাসায় তাকে এক বিদায়-ভোজে নিমন্ত্রণ করে আকণ্ঠ খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়ালেন। সে চলে যাওয়াতে যে সলিমপুরের বিশেষ ক্ষতির কারণ ঘটলো, এ-সম্বন্ধে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের কারো দু'মত দেখা গেল না। সে অভাব ভবিষ্যতে পূরণ হওয়ার বিষয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

রওনা হওয়ার পূর্বদিন সারা বিকেল ধরে জিনিসপত্র গোছানো হোল। আভাবতী ভারী গোছালো মেয়ে। সন্ধ্যার আগেই সব জিনিস বাঁধাছাঁদা ঠিক হয়ে গেল—মায় ট্রাঙ্ক বন্ধ করার আগে স্বামীর আয়না-চিরুনি, পানের ডিবেটি সকলের ওপরে রাখা পর্যন্ত—পাছে বা কখনো পথে দরকার হয়।

সকাল সাড়ে ন'টার ডাউন যাত্রী গাড়ি স্টেশনে এসে লাগলো। ছোট্ট স্টেশন, বেশীক্ষণ গাড়ি দাঁড়ায় না। যাত্রীর দল কে কার ঘাড়ে পড়ে এই রকম অবস্থায় ওঠা-নামা করছে। সুরেশ স্টেশনের কুলীদের সাহায্যে মালপত্র ওঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে স্ত্রীকে মেয়েকামরায় তুলে দিতে গেল। মেয়ে-গাড়ির সামনে প্ল্যাটফরমের কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় এইমাত্র একটি অল্পবয়সী মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে সম্ভবতঃ মালপত্র নামবার অপেক্ষা করছে। সঙ্গে একজন প্রৌঢ়া একটা ছোট্ট ট্রাঙ্ক ও একটা বড় বোঁচকা নিকটে নামালো। সুরেশ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আর একবার ভাল করে চেয়ে দেখলে। না, তার ভুল হয়নি—ঠিকই দেখেছে সে।

সরুপাড় ধুতি পরা, হাত খালি, মাথায় আধরুক্ষ চুল, বিধবা বেশে রেণু। সুরেশ সেখানে আর দাঁড়াতে পারলো না, দিশাহারা ভাবে এসে নিজের গাড়িতে উঠলো। রেণু সম্ভবতঃ তাকে দেখেনি, তার চোখ অন্যদিকে ফেরানো ছিল।···সুরেশের সারা শরীর দিয়ে কি যেন একটা ঝাঁজ বেরুচ্ছিল। নিজের কতকটা অজ্ঞাতসারে তার মনে হোল—উঃ, কি বেঁচেই গিয়েছি! মার কথা যদি তখন না শুনতাম? রাক্ষুসীর ফাঁদই তো বটে! আটকেছিল তো

পা আর একটু হলেই ফাঁদে ? তার আরও মনে হোল, বড়বাবু এ-খবর পূর্বেই জানতেন কিন্তু প্রচার হতে না দিয়ে গোপন রেখেছিলেন।

তারপর কখন গার্ড হুইসিল দিয়েছে, কখন গাড়ি চলেছে এ-সব তার খেয়াল নেই।··· কৃষ্ণচূড়া গাছের সামনে আসতে সে চেয়ে দেখলে প্ল্যাটফরমের পূর্বদিকে তারের বেড়ার ওপরকার খিলানবসানো পাকা ধাপ ডিঙিয়ে আগে আগে মালপত্র হাতে ভজুয়া পয়েন্টসম্যান, পেছনে প্রৌঢ়াটি ও সর্বশেষে নম্রমুখী রেণু, বড়বাবুর কোয়ার্টারের দিকে চলেছে।···

হঠাৎ সুরেশের মনে দূর-সম্পর্কিত সহানুভূতিশূন্য এক আত্মীয়ের দ্বারস্থ এই পিতৃমাতৃহীনা নিরপরাধা অভাগিনী বালিকার ছবিটি সম্পূর্ণ অন্যভাবে ফিরে এল। কার অপরাধে এই প্রস্ফুট-মুকুল-প্রথম-বসন্তের দিনে তার জীবনের আনন্দ-দীপটি নির্বাপিত হয়ে গেল চিরদিনের মত ?···

দ্রুতগামী ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে আর একবার চেয়ে দেখলে—রাক্ষস-গণের মেয়ে ততক্ষণে বড়বাবুর সদর দরজায় পৌছে দাঁড়িয়ে আছে, দরজা তখনও খোলা হয়নি, বোধহয় ভজুয়া কাউকে ডাকতে গিয়ে থাকবে।

পদবৃদ্ধিজনিত কিছুক্ষণ পূর্বের সে আনন্দ সুরেশ আর মনের মধ্যে খুঁজে পেল না।

হাসি

স্টেশনের ওয়েটিং-রুমের ভেতরে বাইরে কোথাও অন্য লোক ছিল না, বেয়ারাটাকেও ডেকে ডেকে পাওয়া গেল না। অগত্যা চায়ের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা কয় বন্ধুতে বেশ করে' ব্যাগ টেনে নিয়ে ঈজি-চেয়ারে শুয়ে পড়লাম।

মাঘের শেষ যদিও, শীত কিন্তু বাংলা দেশের পৌষ মাসের চেয়েও বেশী। রমেন বললে —ওহে, তোমরা যা বোঝো করো, আমি কিন্তু চা নইলে রাত কাটাতে পারবো না। বসো তোমরা, একটা ব্যবস্থা দেখি···

দোর খোলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক তীক্ষ্ণ শীতল পশ্চিমে বাতাস তীরের মত ঘরে ঢুকতেই আমরা হাঁ-হাঁ করে' উঠলাম···রমেন ততক্ষণে চলে' গিয়েছে। খোলা দোরটা বন্ধ করে' দিতে গিয়ে চেয়ে দেখি বাইরে বেজায় কুয়াসা। পৃথ্বীশ আমাদের দলের দার্শনিক। এতক্ষণ সে ব্যাগ দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে' শুয়েছিল, হঠাৎ মুখ খুলে গম্ভীরভাবে বললে—দেখ, আমার কিন্তু একটা Uncanny Sensation হচ্ছে, কেন বল তো ?

আমি বললাম—কি ভাবের Uncanny ? ভূত টুত ?

সে ব্যাগ খুলে ফেলে ইজি-চেয়ারে উঠে বসলো। চারিধারে চেয়ে দেখে বললে—তা ঠিক জানিনে, কিন্তু কেমন যেন···

আমরা সকলেই ততক্ষণে পুনরায় খাড়া হয়ে উঠে বসেছি। সলিল বললে—বিচিত্র নয়।

আমি একটা ব্যাপার জানি, এই রকম একটা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে রাত দশটার পরে লোক থাকতে পারতো না। শুধু তাই নয়, একবার অনেক রাত্রের ট্রেনে এক ভদ্রলোক নেমে রাত্রের মত স্টেশনের ওয়েটিংরুমেই ছিলেন—সকালেও তিনি ওঠেন না দেখে সকলে তুলতে গিয়ে দেখলো তিনি অচৈতন্য অবস্থায় মুখ উপুড় করে' পড়ে' আছেন। তারপর অনেক যত্নে তাঁর জ্ঞান হয়। তিনি সকলের কাছে বলেন, শেষরাত্রির দিকে এক সাহেব এসে তাঁকে ওঠায়। পরে হঠাৎ সে পকেট থেকে একটা ক্ষুর বার করে' নিজের গলায় বসিয়ে এমন জোরে টানতে থাকে যে কাঁচা চামড়া কাটার অস্বস্তিকর খ্যাঁচ খ্যাঁচ আওয়াজে তাঁর সারা শরীর শিউরে ওঠে। তিনি চীৎকার করে' লোক ডাকতে যেতেই দেখেন কেউ কোথাও নেই, সাহেবের চিহ্নও নেই ঘরে -তারপর কি হোল তিনি আর জানেন না। সেই স্টেশনে ওয়েটিংরুমের বাথ-রুমটার মধ্যে এক ছোকরা সাহেব এঞ্জিনীয়র কি জন্যে একবার ঠিক ওই ভাবে গলায় ক্ষুর বসিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তারপর থেকেই এই ব্যাপার ··

আমরা সকলে আমাদের বাথ-রুমটার দিকে চেয়ে দেখলাম। লুপ-লাইনের নির্জন পাহাড়ে জঙ্গলের ধারে, লাইনের ও-পারে কেবল স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টারটা এবং লেভেল-ক্রসিং-এর ফটকে দারোয়ানের গুমটি। ওয়েটিংরুমের বাইরে স্টেশনের হাতার পরেই একটা ছোট্ট পান-সিগারেটের ও চা-এর দোকান। দিনমানে এমন কি · সন্ধ্যার একটু পর পর্যন্তও দেখেছিলাম, তার পর থেকেই আর দোকানীর পাত্তা নেই—দোকান বন্ধ করে' চলে' গিয়েছে।

গল্প ভাল করে' জমতে না জমতে হঠাৎ দোরটা খুলে গেল। একটা কুলীর হাতে কাঁসার থালার ওপর গোটা আষ্টেক পেয়ালা ভর্তি চা নিয়ে ঢুকলো হাসিমুখে রমেন। ঢুকেই বললে —দেখছো? Where there is a will, there is a way। বলেছিলাম না চায়ের ব্যবস্থা করবোই? স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, তাঁর বাড়িও আমাদের জেলায়। তিনি বললেন—বিলক্ষণ, আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে, বাঙালী, চা খাবেন এ তো সৌভাগ্য। ছাড়লেন না কিছুতেই, নিজের বাসা থেকে তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেন .

রমেনের কথা শেষ হতে না হতে দোর ঠেলে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। রমেন প্রায় খেলার পুতুলের মত লাফিয়ে উঠে বললে—এই যে মিত্তির-মশায়,—আসুন আসুন। পরে আমাদের দিকে চেয়ে বললে—ইনিই এখানকার স্টেশন-মাস্টার হরিদাসবাবু। আসুন বসুন।

ততক্ষণে হরিদাসবাবু টেবিলের সামনের হাতলশূন্য বেতের কেদারাটাতে আমাদের সকলের উদ্দেশে অভিবাদনের জন্যে হাত উঁচু করে' গরুড়ের মত বসে' আছেন। মিত্তির-মশায়ের বয়স পঁয়তাল্লিশের কম নয়, দোহারা গড়ন, কানের পাশের চুলগুলোতে বেশ পাক ধরেছে—গোঁপ-দাড়ি কামানো। পশ্চিমের আটা-জলে বেশ স্বাস্থ্যবান শরীর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি এখানে কত দিন আছেন মিত্তির-মশায়?

—আজ্ঞে, এই আসছে ফেব্রুয়ারীতে দেড় বছর হবে। বড় কষ্ট মশাই, মাছ তো একেবারে

মেলে না, বাঙালীর মুখ মোটে দেখতে পাওয়া যায় না। তাই আপনারা আজ এসেছেন শুনে ভারী আনন্দ হোল। উনি চায়ের কথা যেমন তুললেন, আমি বললাম—তার আর কি, আমার বাসা যখন নিকটেই রয়েছে, তখন কি আর···তা আপনারা কতদূর যাবেন সব?

—আমরা সাইকেলে দিল্লী যাবো বলে' বেরিয়েছি, ও-পার থেকে আসছি কি না? এইখানে নদী পার হয়ে ভাগলপুরের পথ ধরে' গিয়ে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে উঠবো ইচ্ছে আছে—ভাগলপুরের গাড়িটা ঠিক এখানে ক'টায় পাওয়া যাবে কাল সকালে?

তারপর অনেক কথাবার্তা ও আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর এবং কথিত ট্রেন-ঘটিত নানা আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদানের পর কথাবার্তার বেগ মন্দীভূত হয়ে পড়লো।

কারুরই ঘুম পাচ্ছিল না, বিশেষ করে' গরম চা খাবার পরেই আলস্য ও তন্দ্রার ভাবটা কেটে গিয়ে সকলেরই শরীর যেন বেশ তাজা হয়ে উঠেছিল। নির্বাণোন্মুখ কথাবার্তার শিখটাকে পুনরায় খোঁচা দিয়ে প্রদীপ্ত করার জন্যেই আমি হঠাৎ বলে উঠলাম—হ্যাঁ মশাই, আপনাদের এ ওয়েটিংরুমের বাথ-রুমে ভূতটুত নেই তো? এ প্রশ্নের পরেই সলিলের সেই অজ্ঞাত স্টেশনটির বাথ-রুম ও ছোকরা এঞ্জিনীয়র সাহেবের গল্প পুনরায় ফিরে এল। পুনরায় আমাদের একচোট হাসি হোল এবং কেউ কেউ এমন ভাবের ভান করলেন যে এ-স্টেশনের বাথ-রুম সম্বন্ধেও তাঁরা ভয়ের ধারণা পোষণ করেন।

রমেন বললে—যত সব গাঁজাখুরি ..

হরিদাসবাবু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। আমাদের উপহার দেওয়া সিগারেটের চতুর্থটির ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি হাই তুলে খাড়া হয়ে বসলেন। বললেন—আপনারা হাসবেন হয়তো কিন্তু আমার নিজের জীবনের একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে বলছি শুনুন।

পরে তিনি পঞ্চম সিগারেটটি ধরিয়ে নিজের অদ্ভুত গল্পটি বলে' গেলেন।

অনেকদিনের কথা। আমার বয়স তখন খুব বেশী না হলেও বারো-তেরোর কম নয়। আমার এক কাকা ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন এবং সে সময়ে তিনি খুলনা মরেলগঞ্জ আউট-পোস্টে থাকতেন। একবার কি উপলক্ষে তা এখন ঠিক স্মরণ হয় না, আমি আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে কাকার কাছে বেড়াতে যাই। কাকা তখন ছিলেন খুলনার বাসাতে, সেইখানেই অনেকদিন আমরা ছিলাম। বেশীদিন থাকবার কথাবার্তা হওয়াতে আমি সেখানকার একটা স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলাম।

আমরা পূজোর পরটাতেই সেবার খুলনা যাই। কয়েক মাস পড়বার পরে গ্রীষ্মের ছুটি হোল প্রায় একমাসের ওপর। কাকাকে ধরলাম তাঁর সঙ্গে তাঁর কার্যস্থান মরেলগঞ্জে যাবো। কাকা আমায় নিয়েও গেলেন। সেই সময়টা মোম-মধু সংগ্রাহকদের লাইসেন্স নতুন করে করবার সময়। কেউ ফাঁকি দিয়ে পুরানো লাইসেন্সের বলে জঙ্গলে মোম-মধু

সংগ্রহ করে কি ।। পাহারা দেবার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের বোট ও স্টীমলঞ্চ সব সময় সুন্দরবনের নদী, খাড়ি ও খালের মধ্যে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিত। কতবার আমি কাকার সঙ্গে এই সরকারী বোটে সুন্দরবনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছি!

আমার মনে এই সুন্দরবনের একটা অপূর্ব স্বপ্নছবি মুদ্রিত আছে। তখন আমি ছেলেমানুষ, সবে তেরো—শহর থেকে গিয়েছি। সুন্দরবনের অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য এই এক মাসের প্রতিদিন আমার ক্ষুধার্ত ব্যগ্র বালক-মনে কি আনন্দের বার্তা বয়ে' আনতো তা আমি মুখে আপনাদের বোঝাতে পারি না। আর কখনও সে-দেশে যাইনি, অনেকদিনের কথা হলেও এখনো মাঝে মাঝে সুন্দরবনের—বিশেষ করে' জ্যোৎস্না-ওঠা সুন্দরবনের ছবি ...অপরিসর খালের শঠির জঙ্গলে ভরা ঢালু পাড় · নতুন পাতা-ওঠা গাব-গাছের ও বন্য গোল-গাছের সারি...খাড়ির মুখে জোয়ারের শব্দ, যখনই মনে হয়, একটা জিনিসের জন্যে বেদনায় এই বয়সেও মনটা কেমন করে ওঠে।

সেদিনের কথাটা আমার বেশ মনে আছে। সুন্দরবনের সেই অংশটা তখন জরীপ হচ্ছিল—তাদের একটা বড় লঞ্চ বড়-গাঙের মাঝখানে বাঁধা থাকতো। দুপুরবেলা সেদিন সেই লঞ্চটাতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। চার পাঁচজন আমীন, একজন কানুনগো, একজন কেরানী—সবাই বাঙালী, সবসুদ্ধ সাত আটজন লোক লঞ্চটাতে। খাওয়া-দাওয়াটা খুব গুরুতর রকমের হোল, তারপর একটু গান-বাজনাও হোল। বেলা পড়ে গেলে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের বজরাটা ছাড়লাম।

ক্রমে রাত হোল, জ্যোৎস্না উঠলো। খালের দু'ধারের নতুন পাতা-ওঠা বনের মাথাটা জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্ করছিল দূর থেকে নৈশ পাখীর দু'একটা অদ্ভুত রকমের ডাক কানে আসছিল জোয়ারের জলে মগ্ন গোল-গাছের আনত শাখাগুলো ভাঁটার পরে একটু একটু করে জল থেকে জেগে উঠতে লাগলো। বাঘের উপদ্রবের ভয়ে সব সময় আমাদের বজরাতে দু'জন বন্দুকধারী সিপাহী থাকতো, তারা বজরার ও-ধারের তোলা-উনুনে রান্না চাপিয়ে দিলে।

রাতটা বড় গরম, গুমোট ধরনের। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছিল না, চারিদিকে একটা নীরব থমথমে ভাব। ছই-এর ভেতরে থাকবার উপায় নেই। বজরার ছাতে তক্তার পাটাতনের ওপর এ-সব গ্রীষ্মের রাতে শুয়ে থাকতে খুব আরাম বটে, কিন্তু অপরিসর খালের দু'ধারের ঘন বন থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বার ভয়ে সেখানে থাকবার যো ছিল না। ছই-এর মধ্যে বসে কাকা ও বিনোদবাবু দাবা খেলছিলেন। ছই-এর ঘুলঘুলিগুলো সব খোলা, আমি নিকটে বসে বই পড়ছি।

খেলতে খেলতে রাত হয়ে গেল দশটার বেশী। সিপাহীদের রান্না হয়ে গেল।

কাকা কি-একটা কঠিন চাল সামলাবার কথা একমনে ভাবছেন—আমি মিটমিটে আলোতে আখ্যান-মঞ্জরী পড়ছি—বিনোদবাবু খেলোয়াড়কে সমস্যায় ফেলবার আত্মপ্রসাদে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ঘুলঘুলির বাইরে ভাঁটার টান ধরা জলের দিকে চেয়ে আছেন। দীর্ঘ বন-গাছের ছায়া পড়েছে জলের ওপর।

এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটলো।

সামনের ঘন বনের মধ্যে অনেক দূর থেকে একটা উচ্চ সুস্পষ্ট কর্কশ অট্টহাসির রব উঠলো —হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···

অবিকল মানুষের গলার আওয়াজের মত হলেও মনে হোল যেন এটা অমানুষিক অস্বাভাবিক স্বর। আমরা কিছু ভাববার পূর্বেই সেইরকম আর একবার এবং তারপর আবার। হাসির শব্দটা এত উচ্চ ও তীক্ষ্ণ যে মনে হোল বনের গাছগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে···মাটি যেন কাঁপছে···বোটটা যেন দুলছে!

সিপাহীরা তাড়াতাড়ি খাওয়া ছেড়ে উঠে এল। কাকা, বিনোদবাবু, আমি সকলেই ছই-এর বাইরে এলাম। গাছপালা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও হাওয়া নেই, পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না—সুমুখে জ্যোৎস্না রাতের চাঁদ বন-গাছের আড়ালে ঢলে পড়ছে। ..

বিনোদবাবু বললেন—কি মশাই রামবাবু? ব্যাপারটা কি?

মাঝিরা ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছে। তারা বজরার মাস্তুলের তলায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বনের দিকে চেয়ে আছে।

আমরা সকলে ছই-এর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় আবার সেই হাসির শব্দটা উঠলো— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···

শব্দটা এত ক্রূর ও মর্মস্পর্শী যে আমাদের সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মাঝিরা দুই কানে হাত দিয়ে বলে উঠলো—আল্লা! আল্লা! কাকা ও বিনোদবাবু ছই-এর মধ্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কাকা বললেন—কি মশাই, হায়েনা নাকি? কিন্তু তাঁর মুখ দেখে ও গলার সুরে মনে হলো, তিনি কথাটা নিজেই বিশ্বাস করেন না। তারপর পরামর্শ হোল নৌকাটা সেখান থেকে সরানো যায় কিনা। কিন্তু ভাঁটার টান এত বেশী যে, বড়-গাঙের টান ঠেলে তত রাত্রে কোনো মতেই অত ভারী বজরাটা উজানে নেওয়া চলে না। অগত্যা সেইখানেই রাত কাটাতে হলো। সবাই জেগে রইলো, কারুর চোখে ঘুম এল না সে রাত্রে।

শেষরাত্রে আর একবার শব্দটা শুনলাম। বনভূমি তখন নিস্তব্ধ—চাঁদ ডুবে গিয়ে নদী আকাশ বন সব অন্ধকারে একাকার! আমার চোখ ঘুমে ঢুলে এসেছে, এমন সময় অন্ধকার-ভরা গভীর বনভূমির দিক থেকে আর একবার সেই বিকট হাসির রোল উঠলো। শেষরাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে সেটা এত অমানুষিক, এত পৈশাচিক ঠেকলো যে তখন আমার বালক-বয়স হলেও হাসিটার প্রকৃত রূপ বুঝে বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

সকালে জোয়ারের মুখে বজরা ছেড়ে আমরা দুপুরের সময় স্টীমলঞ্চে ফিরে এলাম। সেখানে সব কথা শুনে প্রধান সারেং খালাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বললে, ঐ শব্দটা এর আগেও তারা শুনেছে, তবে স্থানটা বড় গভীর বনের মধ্যে বলে' সে-দিকটায় লোক চলাচল খুব কম। শোনা গেল, ঐ বনের মধ্যে নাকি অনেক দূর গেলে প্রাচীন কালের ঘর-বাড়ির

চিহ্ন পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ বৃদ্ধ বকুল-গাছের সারি দেখে মনে হয় কোনো সময়ে সে-সব স্থানে লোকের বাস ছিল।

সে যাই থাকুক—আজও এতদিন পরে যখনই কথাটা মনে পড়ে তখনই এই কথাটাই মনে হয়, গভীর রাত্রির অন্ধকারে, জনহীন জনপদের ধ্বংস-স্তূপের চারিপাশে ঘূর্ণায়মান কোন্ অভিশপ্ত অশরীরী আত্মার পৈশাচিক উল্লাস-ভরা অট্টহাসিই সেদিন কানে গিয়েছিল।··· তাই হাসির রোলটা যখনই মনে আসে, আজও এতকাল পরেও যেন সারা শরীর শিউরে ওঠে!

প্রত্নতত্ত্ব

আমি এ গল্প আমার বন্ধু সুকুমারবাবুর মুখে শুনেছি।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যাঁহারা কিছু আলোচনা করেছেন, তাঁদের সকলেরই কাছে ডাক্তার সুকুমার সেনের নাম সুপরিচিত। ডাক্তার সেন অনেক দিন গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। পাটনা excavation-এর সময় তিনি স্পুনার সাহেবের প্রধান সহকারী ছিলেন। মধ্যে দিনকতক তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের Curator-ও ছিলেন। বৌদ্ধ Iconography-তেও তিনি সুপণ্ডিত। "প্রাগ্‌গুপ্ত যুগের মূর্তি-শিল্প" ও "ভারতীয় মূর্তি-শিল্পের ক্রমবিকাশ" নামক তাঁর প্রসিদ্ধ বই দু'খানা ছাড়া, এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রে এবং বহু দেশী সাময়িক পত্রিকায় এ বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন।

তাঁর পড়বার ঘরটায় নানা স্থানের ভাঙা পুরানো ইট, ভাঙা কাঠের তক্তি-বসানো তুলট কাগজ ও তালপাতার পুঁথির স্তূপ এবং কালো পাথরের তৈরী দেবদেবীর মূর্তির ভিড়ে পা দেওয়ার স্থান ছিল না। এই সব মূর্তির শ্রেণীবিভাগ করতে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন। কোনো নতুন-আনা মূর্তি পেলে তিনি বেশ ভাল করে দেখতেন, পুঁথি মেলাতেন, তারপর টিকিট আঁটতেন "বৌদ্ধমূর্তি—তারা"। দিনকতক পরে এ বর্ণনা তাঁর মনঃপূত হোত না। তিনি আপন মনে বলতেন—উহুঁ, ওটা ললিতক্ষেপ pose হোল যে, তারা কি করে হবে? তারপর আবার 'লেন্স' হাতে মূর্তিটার এ-পিঠ ও-পিঠ ভাল করে দেখতেন। মূর্তিটার যে হাত ভাঙা, সেটার দিকে চেয়ে বলতেন—এ হাতটায় নিশ্চয় পদ্ম ছিল। হুঁ—মানে—বেশ বোঝা যাচ্ছে কি না? তারপর আবার পুরানো টিকিটের ওপর নতুন টিকিট আঁটতেন "বৌদ্ধমূর্তি—জম্ভলা"। তাঁর এ ব্যাপার দেখে আমার হাসি পেত। আমার চেয়েও বিজ্ঞ লোকে ঘাড় নেড়ে বলতো—হ্যাঃ, ও-সব চাকরিবাজী রে বাপু, চাকরিবাজী! নইলে কোথাকার পাটলি-পুত্র কোথায় চলে' গেল, ওঁরা আজ খোঁড়া ইটপাথর সাজিয়ে হুবহু বলে দিলেন—এটা অশোকের নাটমন্দিরের গোড়া, ওটা অশোকের আস্তাবলের কোণ; দেখতে দেখতে এক

প্রকাণ্ড রাজবাড়ি মাটির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠলো।···চাকরি তো বজায় রাখা চাই? কিন্তু নয় রে বাপু, ও-সব চাকরিবাজী!

তবে এ-সব কথার মূল্য বড়ই কম; কারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে আমার ও এ-সব বিজ্ঞ লোকের চিরদিন ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।

সেদিন দুপুর বেলা ডাঃ সেন যখন তাঁর নিজের লাইব্রেরীতে সেনরাজাদের শাসনকাল নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, আমি তখন একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের মত সেখানে গিয়ে হঠাৎ হাজির হলাম। আমাকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। খানিকক্ষণ খোশগল্প করে সেখানে সারাদিনের মানসিক পরিশ্রম দূর করতে বুঝলাম তিনি খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। এ-কথা সে-কথার পর ডাঃ সেন বললেন—চা আনাই, একটা গল্প শোনো। এটা আমি কখনো কারুর কাছে বলিনি, তবে স্পুনার সাহেব কিছু কিছু শুনেছেন।

বাইরে সে দিন খুব শীত পড়েছিল। দরজা বন্ধ করে সুকুমারবাবুর গল্প শোনবার জন্ত বসলাম। চা এল, চা খেতে খেতে সুকুমারবাবু তাঁর গল্প বলতে লাগলেন।

বিক্রমপুরের পুরানো ভিটার কথা বোধহয় কিছু কিছু শুনে থাকবে। এটা কতদিনের, তা সেখানকার লোকে কেউ বলতে পারে না। অনেক দিন ধরে ঢিবিটা ঐ রকমেই দেখে আসছে—এটা কার বা কোন সময়ের তা তারা কিছুই বলতে পারে না।

ঢাকা মিউজিয়ম থেকে সেবার ঐ ঢিবিটা খোঁড়বার কথা উঠলো। এর পূর্বে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ও ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ শাখা থেকে ওটা কয়েকবার খোঁড়বার প্রস্তাব হয়—কিন্তু টাকার যোগাড় করতে না পেরে তাঁরা পিছিয়ে যান। আমার কাছে যখন কথা উঠলো, তখন আমারও মত ছিল না। কারণ, আমার মনে মনে ধারণা ছিল খরচ যা পড়বে তার তুলনায় আমাদের এমন বিশেষ কিছু পাবার আশা নেই। অবশেষে কিন্তু আমার আপত্তি টিকলো না। ওটা খোঁড়বার জন্তে টাকা বরাদ্দ হোল। আমি বিশেষ অনুরোধে পড়ে তত্ত্বাবধানের ভার নিলাম।

গিয়ে দেখলাম, যে-ঢিবিটা কাটাতে হবে তার কাছে আর একটা ঠিক তেমনি ঢিবি আছে। এই ঢিবির কাছে একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তা প্রায় মজে' এসেছে। ঢিবি দুটো খুব বড় বড়। ময়নাকাঁটার বন আর বড় বড় আগাছায় পশ্চিমদিকের ঢিবিটার ওপরের অংশ একেবারে দুর্গম; পূর্বদিকের ঢিবিটা একটু ছোট, তার পেছনের ঢালু দিকটায় খানিকটা ফাঁকা ঘাসের জমি আছে। স্থানটা কতকটা নির্জন।

সাধারণতঃ খননকার্য আরম্ভ করবার সময় আমরা প্রথমটা প্ল্যান তৈরি করে, নিয়ে কাজ আরম্ভ করি। তারপর কাজ এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কতকটা আন্দাজে কতকটা খুব ক্ষীণ সূত্র ধরে, আমরা সেই প্ল্যান ক্রমে ক্রমে বদলে চলি। পাটনা excavation-এর সময় এতে খুব কাজ হয়েছিল। কিন্তু ছোটো দুটো গ্রাম্য ঢিবি খুঁড়ে তুলতে আমি এ-সব করবার আবশ্যক দেখলাম না। আমাদের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খনন-কার্য

চালিয়েছে এমন কোনো লোক ছিল না। তার কারণ এই যে, ওটা খোঁড়া হচ্ছিল ঢাকা P. W. D. থেকে।

এই ঢিবি দুটোর বড়টাকে ওখানকার লোকে বলে "নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা" ও ছোটটাকে বলে "টোলবাটীর ভিটা"। কারুর মতে এই নাস্তিক পণ্ডিত হলেন, বৈষ্ণব ভক্তি-শাস্ত্রকার বল্লভাচার্য। তিনি শেষ বয়সে বৈষ্ণব ধর্ম ত্যাগ করে, শাঙ্কর বেদান্তের ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এজন্য দেশের লোকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে নারাজ হয়। কেউ কেউ বলেন, বল্লভাচার্য বিক্রমপুরের ত্রিশীমানায়ও জন্মান নি। তাঁদের মতে ওটা ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ভিটা। যাক সে কথা। আমি কিন্তু জানতে পেরেছি ওখানে কে বাস করতেন। আমি যা জানতে পেরেছি, পূর্বে কেউ কেউ তা আন্দাজ করে-ছিলেন, কিন্তু জোর করে' কিছু বলতে পারেন নি। আমি জোর করে বলতে পারি, কিন্তু বলি নি। কেন বলি নি, আর কেমন করে আমি তা জানলাম, সেইটেই বলবো।

কিছুকাল ধরে' ঢিবির ওপরকার বন কাটানো হোল। তারপর প্রকৃতপক্ষে খনন কার্য শুরু হোল। আমার সঙ্গে আমার বন্ধু ঢাকা মিউজিয়মের ক—বাবু ছিলেন। তিনি শুধু প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না, তিনি ছিলেন তার চেয়ে বেশী—প্রত্নতত্ত্বগ্রস্ত। প্রধানতঃ তাঁরই আগ্রহে ও উৎসাহে আমরা এ কাজে হাত দিই। দিনের পর দিন ঢিবি দুটোর সামনে একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া-নিম গাছের ছায়ায় ক্যাম্প-চেয়ার পেতে আমরা তীর্থের কাকের মত বসে' থাকতাম। আমার বন্ধুর চোখ মুখের ভাব ও উৎসাহ দেখে আমার মনে হোত, তিনি আশা করেন, খুঁড়তে খুঁড়তে একটা পুরানো আমলের রাজবাড়ি-টাড়ি, বা একটা তাল-পাতায় লেখা আস্ত বাংলা ইতিহাসের পুঁথি, অভাবপক্ষে সেই অজ্ঞাতনাস্তিক পণ্ডিতের fossil শরীরটাই বা মাটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে।

খুঁড়তে খুঁড়তে প্রথমে বেরুলো একটা মাটির ঘট। ও-রকম গড়নের ঘট এখন আর বাংলার কোনো জায়গায় তৈরী হয় কি না জানি না। ঘটের গলার নিচে থেকে তলা পর্যন্ত curve-টি যে দিয়েছিল, সে গ্রাম্য কুমোরটিকে আমি শ্রদ্ধা করি। ঘটটার মধ্যে প্রায় আধ-ঘট কড়ি। হিন্দুরাজত্বে কেনা-বেচার জন্যে কড়ি ব্যবহার হোত তা জান তো? কোন্ অতীত দিনে গৃহস্বামী ভবিষ্যৎ দুর্দিনের ভয়ে কড়িগুলো সযত্নে ঘট ভরে' মাটির মধ্যে পুঁতে রেখে দিয়েছিলেন, সে ভবিষ্যৎ কত দিন হোল সুদূর অতীতে মিলিয়ে গিয়েছে, সঞ্চিত অর্থের আর প্রয়োজন হয় নি। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক জিনিস বেরুতে লাগলো। আরও মাটির অনেক ভাঙা ঘট, কলসী, একখানা মরিচাধরা লাল রঙের তলোয়ার, একটা প্রদীপ, ভাঙ্গা ইটের কুচো এবং সকলের শেষে বেরুলো একটা কাল পাথরের দেবীমূর্তি। এই মূর্তিটিকে নিয়েই আমার গল্প, অতএব এইটাই ভাল করে বলি।

দেবীমূর্তিটি পাওয়া যায় টোলবাড়ির ভিটায়। মূর্তিটি রাজমহলের কালো পাথরের তৈরী, চক্‌চকে পালিশ করা। বহু দিন মাটির তলায় থেকে সে পালিশ যদিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মোটের ওপর তখনও যা ছিল, তা খুব কম মূর্তিতেই আমি দেখেছি। মূর্তিটি সরস্বতী

দেবীর হলেও, তাতে বৌদ্ধ-ভাস্কর্যের কিছু প্রভাব আছে বলে' মনে হয়েছিল। হাতে বীণা না থাকলেও দেবী না হয়ে দেবমূর্তি হলে, তাকে মঞ্জুশ্রী মূর্তি বলে অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারতো।

মূর্তিটা যখন পরিষ্কার করে আমার সামনে আনা হোল, তখন তার দিকে চেয়েই আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। অনেক মূর্তি গত পনরো বৎসর ধরে পরীক্ষা করে আসছি—কিন্তু এ কি? বাটালির মুখে পাথর থেকে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে কি করে! খানিকক্ষণ এক-দৃষ্টে মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলাম। আমি খুব কল্পনাপ্রবণ নই, কিন্তু সেদিন সেই নিস্তব্ধ দুপুরবেলায় পত্রবিরল ঘোড়া-নিম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আমার মনের মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গেল। অল্পক্ষণ···অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্যে মনের মধ্যে এক অপূর্ব ভাব...সৌন্দর্যে ঝলমল চক্‌চকে কাল পাথরের পালিশ করা নিটোল সে দেবীমূর্তির, তার মুখের দৃঢ়রেখাগুলির, দেহের গঠনের শিল্প-ভঙ্গির হাতের আঙুলগুলি বিন্যাসের সুন্দর ধরনের···সকলের ওপর মূর্তির মুখের সে হাসি-মাখা জীবন্ত সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শিল্পের যে প্রভাব কালকে তুচ্ছ করে যুগে যুগে মানুষের প্রাণ স্পর্শ করছে, তার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় সেই আমার প্রথম হোল।···জয় হোক সে অতীত যুগের অজ্ঞাত-নামা শিল্পীর···জয় হোক তার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার!···

মূর্তিটাকে বাড়ি নিয়ে এসে, আমার লাইব্রেরীতে কাগজ-চাপা ধ্যানিবুদ্ধের দলের মধ্যে তাকে রেখে দিলাম। রোজ সকালে উঠে দেখতাম—দীর্ঘ ভ্রূ-রেখার নিচে বাঁশ-পাতার মত টানা চোখ দুটোর কোণ হাসিতে যেন দিনদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কয়েকদিন ধরে নানা কথা মনে হতে লাগলো। খুঁড়তে খুঁড়তে এমন কোনো জিনিস পাই নি, যাতে মূর্তিটির বা ভিটার সময় নিরূপণ করতে পারি। তবে মূর্তিটি গুপ্তযুগের পরবর্তী সময়ের এবং পূর্ববঙ্গের শিল্পীর হাতে তৈরী, এটা আমি তার মাথার ওপর ছাতার মত চিহ্ন দেখে কতকটা আন্দাজ করতাম। পাথরের মূর্তির মাথার ওপর এই গোল ছাতার মত চিহ্ন, পূর্ববঙ্গের ভাস্কর্যের একটা রীতি—এ আমি অন্য অন্য মূর্তিতেও দেখেছি।

সেদিন রবিবার। সন্ধ্যাবেলাটা আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর সঙ্গে এক বাজী দাবা খেলে সকাল সকাল শুতে গেলাম।

এইবার যে কথা বলবো, সে কেবল তুমি বলেই তোমার কাছে বলছি—অপরের কাছে এ কথা বলতে আমার বাধে; কারণ, তাঁরা আমায় বিশ্বাস করবেন না। অনেক রাতে কি জানি কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে কিসের অত্যন্ত সুগন্ধ পেলাম। পূজার মন্দিরে যেমন ধূপধুনো গুগ্‌গুল, ফুল, ঘি চন্দন সবসুদ্ধ মিলে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ পাওয়া যায়, এটা ঠিক সেই ভাবের। সুগন্ধটা আমার নিদ্রালস মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে আমায় কেমন একটা নেশায় অভিভূত করে ফেললো। রাত ক'টা হবে ঠিক জানি না···মাথার কাছে ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করছিল···হঠাৎ দেখলাম, খাট থেকে কিছুদূরে ঘরের মেঝের কে একজন দাঁড়িয়ে··· তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, পরণে বৌদ্ধ পুরোহিতের মত হলদে পরিচ্ছদ···মুখের হাতের অনাবৃত

অংশের রং যেন সাদা আগুনের মত জ্বলছে···বিস্মিত হয়ে জোর করে চোখ চাইতেই সে মূর্তি কোথায় মিলিয়ে গেল!···বিছানায় তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম ঘড়িতে দেখলাম রাত দুটো··· ভাল করে চোখ মুছলাম, ঘরে কেউ কোথাও নেই। ভাবলাম আরে গেল যা, রাত দুপুরের সময় এ যে দেখছি ছেলেবেলাকার সেই Abou Ben Adhem (may his tribe increase)! খানিকক্ষণ বিছানায় বসে থাকবার পর ঠিক করে নিলাম, ওটা ঘুমের ঘোরে কি রকম চোখের ধাঁধা দেখে থাকবো। তারপর আবার শুয়ে পড়লাম, একটু পরে বেশ ঘুম এল। কতক্ষণ পরে জানি না, আবার কি জানি কেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল···ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে সুগন্ধটা পেলাম···আবার সেই নেশা! এবার নেশাটা যেন আমায় পূর্বের চেয়েও বেশী অভিভূত করে' ফেললে···তার পরই দেখি, সেই মুণ্ডিত-মস্তক পীতবসন জ্যোতির্ময় বৌদ্ধ-ভিক্ষু আমার খাটের অত্যন্ত কাছে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন!···

তারপর আরও কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটলো।

হঠাৎ আমার ঘরে দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল···দেখলাম, এক বিস্তীর্ণ স্থান, কত বাড়ি, শ্বেত-পাথরে বাঁধানো কত চত্বর, কত গম্বুজ, দেউল···অনেক মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধ-ভিক্ষুর মত-পরিচ্ছদ-পরা লোকেরা এ-দিক ও-দিক যাতায়াত করছেন, অসংখ্য ছাত্র ঘরে ঘরে পাঠনিরত···একস্থানে অশোক-বৃক্ষের ছায়ায় শ্বেত-পাথরের বেদীতে একদল তরুণ যুবক পরিবৃত হয়ে বসে আমার পরিচিত সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু! দেখে মনে হোল, তিনি অধ্যাপনায় নিরত এবং যুবক-মণ্ডলী তাঁর ছাত্র। অশোক-কুঞ্জের ঘন-পল্লবের প্রান্তস্থিত রক্ত-পুষ্পগুচ্ছের ঝরা পাপড়ি গুরু ও শিষ্যবর্গের মাথার ওপর বর্ষিত হতে লাগলো।

দেখতে দেখতে সে দৃশ্য মিলিয়ে গেল···আমার তন্দ্রালস কানের মধ্যে নানা বাজনার একটা সম্মিলিত সুর বেজে উঠলো···এক বিরাট উৎসবসভা! উৎসব-বেশে সজ্জিত নরনারীতে সভা ভরে ফেলেছে···সব যেন অজন্তার গুহার চিত্রিত নরনারীরা জীবন্ত হয়ে উঠে বেড়াচ্ছে। কোন্ প্রাচীন যুগের হাবভাব, পোশাক পরিচ্ছদ···সভার চারিধারে বর্শাহাতে দীর্ঘদেহ সৈনিকরা দাঁড়িয়ে, তেজস্বী যুদ্ধের ঘোড়াগুলো মূল্যবান সাজ পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ঠুকছে ··সভার মাঝখানে রক্তাম্বর-পরণে চম্পক-গৌরী কে এক মেয়ে···মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল ইস্পাতের বর্ম আঁটা এক যুবক···তার কোমরে ঝক্‌ঝকে ইস্পাতের খাপে বাঁকা তলোয়ার দুলছে···গলায় ফুলের মালা···মুখে বালকের মত সরল সুকুমার হাসির রেখা। মেয়েটির নিটোল সুন্দর হাতটি ধরে যুবকের দৃঢ় পেশীবহুল হস্তে যিনি স্থাপন করলেন—ভাল করে চেয়ে দেখলাম, তিনি আমার রাতের বিশ্রামের ব্যাঘাতকারী সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু।

বায়স্কোপের ছবির মত বিবাহ-সভা মিলিয়ে গেল। হঠাৎ আমার হাত-পা যেন খুব ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো। শীতে দাঁতে দাঁত লাগতে লাগলো···পায়ের আঙুল যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। চোখের সামনে এক বিস্তীর্ণ সাদা বরফের রাজ্য···ওপর থেকে বরফ পড়ছে...তুষার-বাষ্পে চারিধার অস্পষ্ট···সামনে পেছনে সুউচ্চ পর্বতের চূড়া···সামনে এক সঙ্কীর্ণ পথ এঁকে বেঁকে উচ্চ হতে উচ্চতর পার্বত্য প্রদেশে উঠে গিয়েছে। এক দীর্ঘদেহ ভিক্ষু সেই ভীষণ দুর্গমপথ

বেয়ে ভীষণতর হিম-বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে পথ চলছেন···তাঁর মাথা যেন ক্রমে নুয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে···কিন্তু তবু তিনি না থেমে ক্রমাগত পথ চলছেন···বহুদূরের এক উত্তুঙ্গ তুষারমণ্ডিত পর্বতচূড়া কিসের আলোয় রক্তাভ হয়ে দৈত্যের হাতের মশালের মত সে বিশাল তুহিন-রাজ্যের দূর প্রান্ত আলোকিত করে ধক্ ধক্ করে' জ্বলছে।···

তুষার-বাষ্প ঘন হতে ঘনতর হয়ে সমস্ত দৃশ্যটা ঢেকে ফেললো। তারপরই চোখের সামনে —এ যে আমারই চিরপরিচিত বাংলা দেশের পাড়াগাঁ···খড়ের ঘরের পেছনে ছায়াগহন বাঁশবনে বিকাল নেমে আসছে! বৈঁচি-ঝোপে শালিক পাখীর দল কিচ কিচ করছে। কাঁটালতলায় কোন গৃহস্থের গরু বাঁধা! মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে এক তরুণ যুবক! তার সামনে আমার খুঁড়ে-বার-করা সেই দেবীমূর্তি!···দেখে মনে হোল, যুবকের অনেক দিনের স্বপ্ন ঐ পাথরের মূর্তিতে সফল হয়েছে···বর্ষাসন্ধ্যার মেঘ-মেদুর আকাশের নিচে ঘনশ্যাম কেতকী-পল্লবের মত কালো ভাবগভীর চোখদুটি মেলে সে পাথরের মূর্তির মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।···

হঠাৎ সে দৃশ্যও মিলিয়ে গেল। দেখি, আমি আমার ঘরে খাটেই শুয়ে আছি, পাশে সেই বৌদ্ধ-ভিক্ষু। এবার তিনি কথা বললেন। তাঁর কথাগুলো আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বললেন—তুমি যে মূর্তিটি মাটি খুঁড়ে বার করেছ, তারই টানে অনেক দিন পরে আজ আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম। নয় শ' বৎসর আগে আমি তোমার মতই পৃথিবীর মানুষ ছিলাম। যে স্থান তোমরা খুঁড়েছ, ওই আমার বাস্তুভিটা ছিল। তুমি জ্ঞানচর্চায় সমস্ত জীবন যাপন করেছ, এই জন্যেই তোমার কাছে আসা আমার সম্ভব হয়েছে; এবং এই জন্যেই আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমার জীবনের কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনা তোমাকে দেখালাম। আমি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান,—নয়পালদেবের সময়ে আমি নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির ছিলাম। ভগবান তথাগতের অমৃতময়ী বাণীতে আমার মন মুগ্ধ হয়েছিল; সে জন্য দেশের হিন্দু-সমাজে আমার জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। দেশের টোলের অধ্যাপনা ছেড়ে আমি নালন্দা যাই। বুদ্ধের নির্মল ধর্ম যখন তিব্বতে অনাচারগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল, তখন ভগবান শাক্যশ্রীর পরে আমি তিব্বত যাই সে ধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্যে। আমার সময়কার এক গৌরবময় দিনের কথা আজও আমার স্মরণ হয়। আজ অনেকদিন পরে পৃথিবীতে—বাংলায় ফিরে এসে সে-কথা বেশী করে মনে পড়েছে।···চেদীরাজ কর্ণ দিগ্বিজয়ে বার হয়ে দেশ জয় করতে করতে গৌড়-মগধ-বঙ্গের রাজা নয়পালদেবের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে যে-দিন সন্ধি করলেন, আমি তখন নালন্দার অধ্যাপক। মনে আছে, উৎসাহে সে-দিন সারারাত্রি আমার নিদ্রা হয়নি। এই সন্ধির কিছুদিন পরেই কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে নয়পালদেবের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের যে বিবাহ হয়, আমিই সে বিবাহের পুরোহিত ছিলাম।···অল্প বয়সে আমি একজন গ্রাম্য শিল্পীর কাছে পাথরের মূর্তি গড়তে শিখি এবং অবসর মত আমি তার চর্চা রাখতাম। তারপর আমি যখন পিতামহের টোলে সারস্বত ব্যাকরণের ছাত্র, তখন সমস্ত শক্তি ও কল্পনা ব্যয় করে

জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এক মূর্তি গড়ি। মূর্তিটি আমার বড় প্রিয় ছিল। ওই মূর্তিটির টানেই অনেক দিন পরে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলাম। দেশের লোকে আমায় নাস্তিক বলতো; কারণ, আমি একেই বৌদ্ধ ছিলাম, তার ওপর সাধারণভাবের ধর্মবিশ্বাস আমার ছিল না। যে অরুণচ্ছটারক্ত হিমবান্ শৃঙ্গ জনহীন তুষার-রাজ্য আলোকিত করেছে—যা তোমায় দেখিয়েছি, তা সত্যের রূপ! সাধারণ লোকের পক্ষে সে-সত্য দুরধিগম্য। আমার কথা ধরি না, কারণ আমি নগণ্য। কিন্তু যে বিশাল সঙ্ঘারাম আমাদের সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল, তার সমস্ত অধ্যাপকই সে উচ্চ দার্শনিক সত্যতে চিরদিন লক্ষ্য রেখে চলেছিলেন। আমিও অনেক বিপদ মাথা পেতে নিয়ে, সাধ্যমত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলাম। যেখানে এখন আছি, সেখানে সে-সব যুগপূজ্য জ্ঞান-তপস্বী আমার নিত্য সঙ্গী। তোমরাও অমৃতের পুত্র—সে লোক তোমাদের জন্যেও নির্দিষ্ট আছে। ··অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযান জয়যুক্ত হোক।···

বৌদ্ধ-ভিক্ষু কোথায় মিলিয়ে গেলেন।···কিসের শব্দে চমক্ ভেঙে গিয়ে দেখি, ভোর হয়েছে বাইরের বারান্দায় চাকরের ঝাঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

ডাঃ সেন গল্প শেষ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—মূর্তিটা কোথায়?

ডাঃ সেন বললেন—ঢাকা মিউজিয়মে।

দাতার স্বর্গ

শ্রেষ্ঠী কর্ণসেন ছিলেন খুব দাতা। পথের দুঃখী আতুর নিরাশ্রয় লোককে চিরদিন তিনি আশ্রয় দিয়ে এসেছেন। সকলে বলতো তাঁর মত লোক আর হয় না; স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা নেমে এসেছেন নবরূপ ধরে' প্রজার দুঃখ দূর করতে।

সামান্য ভাবে থাকলেও কর্ণসেন ছিলেন মস্ত ধনী। এই সব ধন বিতরণ করে' তিনি চিরদিন মহা সুখ পেয়ে এসেছেন। পথ চলতে চলতে অন্য অন্য কৃপণ-ধনীদের মূল্যবান অশ্বযোজিত-রথে রাজপথ কাঁপিয়ে চলে যেতে দেখে কর্ণসেন মনে মনে ভাবতেন—এই সব স্বার্থপর ধনীর চেয়ে আমি কত বড়! পরক্ষণেই কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবতেন—না না, ও-কথা না, কে কাকে দেয়? ভগবান শুধু আমার মধ্যে দিয়েই তাঁরই ধন তাঁর জীবদের দিচ্ছেন বই তো নয়।

তখনই আবার তাঁর মনে হোত—আমি কি নিরহঙ্কার! আছে আছে, আমার ভেতরে কিছু না থাকলেই কি আর এত লোক থাকতে কেবল আমাকেই দিয়ে ভগবান তাঁর···অমনি আবার সামলে নিয়ে জোর করেই মনকে বোঝাতেন—না না, ওকি, না, ছিঃ!

কিন্তু অহঙ্কার যতই ছুঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করুন না কেন, মনের কোন্ গোপন-কক্ষে এ ভাব তাঁর জেগেই থাকতো—আমি এমন যে দানের আত্মপ্রসাদটাও চাপতে চেষ্টা করছি। ওই সব লোকে আর আমাতে কত তফাত! আমি একজন সাধু ব্যক্তি!

সেবার রাজ্য জুড়ে মড়ক উপস্থিত হোল। চারিদিকে লোক বর্ষাকালের বাদল-পোকার মত মরতে শুরু করে' দিল। রাজ্যময় মহা হাহাকার! নিরাশ্রয় রোগীদের ভিড়ে নগরের আরোগ্যশালাগুলি ভর্তি হয়ে গেল। নতুন রোগী এসে আর স্থান পায় না নগরের পথের ওপর তাদের মৃতদেহের স্তূপ ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো।

সকল রকম সৎকার্যের চিন্তা দাতা কর্ণসেনেরই মনে সকলের আগে এসে পৌঁছতো। রাত্রে শুয়ে তাঁর হোল—এক কাজ করি না কেন? আমার এই এত বড় প্রাসাদ যদি আরোগ্যশালার জন্যে ছেড়ে দিই, তবে কত রোগী এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারে। আমার এত বড় প্রাসাদে কি প্রয়োজন?

পর মুহূর্তেই তাঁর মনে হোল—ওই! ওই যে আমার মনে একথা উঠলো, সে শুধু এই বিশাল রাজ্যের মধ্যে ভগবানের একমাত্র চিহ্নিত দাস বলেই। কই, আর তো কেউ···

তখনিই আবার ভাবলেন—না, ছিঃ, ও-সব অহঙ্কারের কথা।

সেদিন সমস্ত দিন ধরে' তাঁর মনে হতে লাগলো—দিই বাড়িখানা ছেড়ে! লোকে এসে এখানে আশ্রয় নিক্।

তারপর তিনি ভাবলেন—না, যাক্ গে যাক্। বাড়ি দেবার কোনো দরকার নেই। কতদিন এ মড়ক চলবে তার কিছু ঠিকানা নেই, বাড়ি ছেড়ে দেওয়া, সে যে মহা অসুবিধে।

পথ চলতে চলতে তাঁর চোখে পড়তো, নিরাশ্রয় আর্তদের অসহায় শীর্ণ মুখগুলি!

তাঁর মন তখনি দয়ার আবেগে ভরে' উঠতো, ভাবতেন—দিই বাড়ি ছেড়ে! এদেরই তো বাড়ি। ভগবান আমার মধ্যে দিয়ে তাঁর দয়া প্রকাশ করেছেন, এই ইচ্ছা তাঁরই দেওয়া···

মনের এক গভীর গোপন-তল থেকে এ-কথা জাগতো—উঃ! দেখছ, দেখছ! মনটা আমার কি রকম দেখেছ একবার!

হতভাগ্য দরিদ্রের মৃত্যুকাতর শীর্ণ শুষ্ক মুখগুলো মনে করে' তাঁর চোখে জল আসতো।

মনে তাঁর উঁচুভাবের ঢেউ এল—গেল। অন্যান্য বার এই সব ভাবের আবেগেই তিনি অকাতরে পরের দুঃখ মোচন করে' এসেছেন, এবার কিন্তু তিনি মনের সে ভাবটাকে চেপে রাখলেন। ভাবলেন—না না, বাড়ি নয়, টাকা যেমন দিই, তেমনি কিছু দেব এখন।

মনের সে গোপন-তল থেকে এ-কথা উঠলো—আমি যে খারাপ লোক তা তো নয়। কতবার তো কত দিয়েছি—এবার যদি নাই দিই? আর লোক যে আমি কৃপণ তাও তো নয়—আমি উঁচুই। তবে এবার ··

সেবা-যত্ন শুশ্রূষার অভাবে মৃত হতভাগ্য দরিদ্রের শবের পূতিগন্ধে নগরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে, নগরের এক কৃপণ-ধনী—এ পর্যন্ত যিনি কোনো সৎকাজে এক কানাকড়িও কোনো দিন দান করেন নি—তাঁর বৃহৎ অট্টালিকা ছেড়ে দিয়েছেন নিরাশ্রয় রোগীদের আরোগ্য লাভের জন্য।

মহাপ্রাণ ধনীর জয়-গীতে নগর-পথ মুখরিত হতে লাগলো।

কর্ণসেন ভাবলেন—এঃ, কাজটা বড় খারাপ হয়ে গেল দেখছি। তাই তো, কি করা যায়!

পরদিন তিনি শুনলেন, কৃপণ-ধনীর মহান দানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নগরের আর একজন ধনী বণিক তাঁর বাড়িও রোগীদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন।

আনন্দ-কোলাহলে নগরে কান পাতা দায় হোল।

অন্যান্য বার সকল মহৎকার্যের অগ্রণী হতেন কর্ণসেন। তাঁরই দেখাদেখি অপরে তাঁর পথ ধরতো। এবার তিনি সে গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁর মনে হতে লাগলো—কই! আমিই যে তাঁর চিহ্নিত ব্যক্তি, তা কই? এতদিন ভুল বুঝেছি। কাজ করাবেন ইচ্ছে করলে ভগবান পাষাণকেও গলিয়ে কাজ করাতে পারেন। নইলে পরীক্ষিৎ ওই কঞ্জুষ, ও কিনা নিজের বাড়ি...

কর্ণসেনের অহংকার চূর্ণ হোল। তিনি ভাবলেন—ভগবানের কাছে চিহ্নিত অচিহ্নিত পাত্রাপাত্র নেই—সবাই সমান। আর আমিই বা এমন সাধুব্যক্তি কই? আমি যে ত্যাগ স্বীকার করতে পেরে উঠলাম না, অপরে তা তো করলে!

মনে মনে নিজেকে ত্যাগী পরার্থপর বলে, যে আত্মপ্রসাদ তাঁর মনে জাগতো, তা একেবারে দূর হয়ে গেল। নিজের প্রতি একটা অশ্রদ্ধাই তাঁর এসে পড়তে লাগলো।

এদিকে প্রতিদিনই শোনা যেতে লাগলো, মহাপ্রাণ দাতাগণের পথ অনুসরণ করে আরও অনেক লোকে তাঁদের বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন। কর্ণসেনের বন্ধু-বান্ধবেরা এসে তাঁকে চুপি চুপি জানিয়ে গেল, তিনিও যেন শীঘ্র একটা কিছু করেন। লোকে এবার তাঁকে নীরব থাকতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। পূর্বে সকল সৎকাজই তিনি সকলের আগে করতেন, এবার তিনি অবিলম্বে একটা কিছু না করলে দুর্নাম রটবে।

কর্ণসেন ভাবলেন—পরের দেখাদেখি এবং লোকের কাছে দুর্নাম রটবার ভয়ে তাঁকে দান করতে হবে! কি গৌরব সে দানের? আর যদিও বাইরের লোকে তার গৌরব করতে পারে কিন্তু মনে মনে তিনি তো বেশ বুঝতে পারছেন এ দানে তাঁর কিছুমাত্র মহত্ত্ব নেই। যদি তাঁকে দান করতে হয় তো সে দায়ে পড়ে, মান বাঁচাবার জন্যে। এ দায়ের কথা মনে হলেই যে তাঁর মন নিচু হয়ে যাবে! অন্যান্য বারের মত সে উচ্চ আত্মপ্রসাদ কই এখানে?

কর্ণসেন মনে মনে মহা চটে গিয়ে ঠিক করলেন, তিনি কিছুই করবেন না। লোকে যা বলে বলুক, যে দান স্বার্থপ্রসূত, যার মূলে লোকের কাছে নিজের মান বাঁচানোর কথা নিহিত, এমন দান তিনি কখনো করবেন না।

শয্যায় শুয়ে অনেক রাত্রে কর্ণসেনের ঘুম ভেঙে গেল! জানালার বাইরে চেয়ে দেখলেন, দূর আকাশের নীল-সাগরের পারে একটি নক্ষত্র যেন তাঁর দিকেই চেয়ে জ্বলছে, প্রলয়কালের বিশ্বের অনন্ত-জলময়ী প্রসারতার মাঝখানে অনাদিকারণ প্রজাপতির চিরজাগ্রত নেত্র-জ্যোতির মত!...আকাশের নিথর নীল বুকে শুভ্র-জ্যোৎস্নার তরঙ্গগুলো যেন তাঁরই সৃজন বীণার মর্মস্পর্শী নীরব রবে কেঁপে কেঁপে উঠছে!...

কর্ণসেন ভাবলেন—উঃ, কি সুযোগই হারিয়েছি! আজ যদি আমার বাড়িখানা ছেড়ে দিতাম তো এই রাত্রের সঙ্গে আমার প্রাণের একটা যোগ হোত। আমার সঙ্গে ভগবানের আর কোন সম্পর্কই নেই, কারণ আমি স্বার্থপর, আমি তাঁর প্রেরণার অবমাননা করেছি।

আকাশের সে দূর-নক্ষত্রটির ভর্ৎসনা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কর্ণসেন জানালা বন্ধ করে দিলেন।...

হঠাৎ আতুরদের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখগুলি আবার তাঁর মনে এল—আহা, এই রাত্রে তারা সব আশ্রয় অভাবে পথে শুয়ে রয়েছে!...

কর্ণসেন ভাবলেন—দিই না বাড়িখানা ছেড়ে। অবশ্য এ দানে আমার আর কোনো গৌরব নেই, কিন্তু তা নাই বা হোল, এই নিরাশ্রয় লোকগুলো তো আশ্রয় পাবে? এই শীতে তারা যে সব পথে শুয়ে মরছে!...

কর্ণসেনের মনের সে গোপন কক্ষটিতে এবার আর কোনও সুর শুনতে পাওয়া গেল না। তার পরদিন নগরের লোকে শুনলে, কর্ণসেন তাঁর বিরাট প্রাসাদ-তুল্য বাড়ি নগরের দুঃস্থ আতুরদের আরোগ্যশালার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারটা তখন আর নতুন নয়। কেউ কেউ একটু আধটু প্রশংসা করলে। কেউ ভাবলে, দেবার ইচ্ছে ছিল না, মানের দায়ে দিতে হোল।

যথাসময়ে কর্ণসেনের মৃত্যু হোল। তিনি তাঁর কৃতকার্যের ফলাফল শুনতে যমরাজের খাস-দরবারে নীত হলেন।

সামনে প্রকাণ্ড খাতা খুলে বসে চিত্রগুপ্ত।

তিনি খাতা দেখে বললেন—দাতার স্বর্গ-ই হচ্ছে সমস্ত স্বর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ। এক একটি দানে শত মন্বন্তর করে সে-স্বর্গে বাস করবার অধিকার জন্মায়। তোমার একশত মন্বন্তর দাতার স্বর্গে বাস করা মঞ্জুর হয়েছে।

কর্ণসেন একটু ভেবে মাথা চুলকে বললেন—বোধহয় হিসেবে ভুল হয়ে থাকবে, আর একবার না হয়—কারণ...

চিত্রগুপ্ত খাতার পাতে আর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন—না, ভুল হয় নি। তুমি একবার তোমার বসতবাটী অত্যন্ত মড়কের সময় তোমার দরিদ্র প্রতিবেশীদের উপকারের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলে—এই একটি ছাড়া তোমার অন্য কোনো দানের কথা তো খাতায় লেখা দেখছি নে বাপু।

কর্ণসেন বেকুপের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

যমরাজ অন্য কি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অন্তর্যামী; কর্ণসেনের মনের কথা তাঁর মনে গিয়ে পৌঁছলো। তিনি মুখ তুলে হেসে বললেন—বুঝেছি বাপু। কিন্তু তোমার অন্য অন্য দানের পুরস্কার আমরা তো তোমাকে সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিয়েছি। তুমি দান করে কি একটা সুন্দর আত্মপ্রসাদ উপভোগ কর নি?

কর্ণসেন বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে তা স্বীকার করলেন।

যমরাজ বললেন—সেই-ই তো আমাদের পুরস্কার! তোমার জন্মভূমি তোমার দানের খ্যাতিতে ভরে গিয়েছে, তুমি নিজে একটা সুন্দর তৃপ্তি অনুভব করেছ, ওই তো সে-সব দানের পুরস্কার। কিন্তু তুমি একটি দান একবার করেছিলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েই শুধু পরের দুঃখ মোচন হবে বলে। নিজের দিকে সে-বার তুমি চাও নি। তোমার সে দানের পুরস্কার তখন হাতে হাতে দিয়ে তোমার দানকে অপমানিত করতে আমরা সাহস করিনি। সেইটিই তোমার পাওনা আছে।

খুঁটি-দেবতা

ঘোষ-পাড়ায় দোলের মেলায় যাইবার পথে গঙ্গার ধারে মঠটা পড়ে।

মঠ বলিলে ভুল বলা হয়। ঠিক মঠ বলিতে যাহা বুঝায়, সে ধরনের কিছু নয়। ছোট খড়ের ঘর খান চার পাঁচ মাঠের মধ্যে। একধারে একটা বড় তেঁতুল গাছ। গঙ্গার একটা ছোট খাল মাঠের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়া শুকাইয়া মজিয়া গিয়াছে—জোয়ারের সময়ে তবুও খালটা কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ঠিক সেই সময় জেলেরা দোয়াড়ী পাতিয়া রাখে। জোয়ারের তোড়ের মুখে মাছ খালে উঠিয়া পড়ে, ভাটার টানে নামিবার সময় দোয়াড়ীর কাঠিতে আটকাইয়া আর বাহির হইতে পারে না। কাছেই একটু দূরে শঙ্করপুর বলিয়া ছোট গ্রাম।

কিছুকাল পূর্বে রেল-কোম্পানী একটা ব্রাঞ্চ লাইন খুলিবার উদ্দেশ্যে খানিকটা জমি সার্ভে করাইয়া মাটির কাজ আরম্ভ করাইয়াছিলেন, কোনো কারণে লাইন বসানো হয় নাই। মাঠের উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রকাণ্ড উঁচু রেলওয়ে বাঁধটার দুই পাশের ঢালুতে নানাজাতীয় কাঁটাগাছ, আকন্দ ও অন্যান্য বুনো গাছপালা গজাইয়া বন হইয়া আছে। আকন্দ গাছটাই বেশী।

খুঁটি-দেবতার অপূর্ব কাহিনী এইখানেই শুনিয়াছিলাম।

গল্পটা বলা দরকার।

শঙ্করপুর গ্রামের পাশে ছিল হেলেঞ্চা-শিবপুর। এখন তাহার কোনো চিহ্ন নাই। বছর পনেরো পূর্বে গঙ্গায় নাটিয়া গিয়া মাঝ-গঙ্গার ওই বড় চরটার সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্বস্থলীর চৌধুরী জমিদারদের সহিত ওই চরার দখল লইয়া পুরানো প্রজাদের অনেক দাঙ্গা ও মকদ্দমা হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত প্রজারাই মামলায় জেতে বটে, কিন্তু চরটা চিরকালই বালুময় থাকিয়া গেল, আজ দশ বৎসরের মধ্যে চাষের উপযুক্ত হইল না। পাঞ্জা দখলে আসিলেও চরটা প্রজাদের কোনো উপকারে লাগে না, অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়াই থাকে। আজকাল কেহ কেহ তরমুজ, কাঁকুড় লাগাইতেছে দেখা যায়।

এই গ্রামে রাঘব চক্রবর্তী পূজারী বামুন ছিলেন।

রাঘব চক্রবর্তীর কেহ ছিল না। পৈতৃক আমলের খড়ের বাড়িতে একা বাস করিতেন; একাই নদীর ঘাট হইতে জল আনিয়া, বনের কাঠ কুড়াইয়া রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাইতেন। গায়ে শক্তিও ছিল খুব, পিতামহের আমলের সেকেলে ভারী পিতলের ঘড়া ভরিয়া দুটি বেলা এক পোয়া পথ দূরবর্তী গঙ্গা হইতে জল আনিতেন। ক্লান্তি বা আলস্য কাহাকে বলে জানিতেন না।

রাঘব চক্রবর্তী পয়সা চিনিতেন অত্যন্ত বেশী। বাঁশের চটার পাখা তৈয়ারী করিয়া কুড়ি দরে ডোমেদের কাছে ঘোষ-পাড়ার দোলে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন। অবসর সময়ে ঝুড়ি, কুলো ডালা বুনিয়া বিক্রয় করিতেন। মাটির প্রতিমা গড়িতে পারিতেন। উলুখড়ের টুপি, ফুল-ঝাঁটা তৈয়ারী করিতেন। সুন্দর কাপড় রিপু করিতে পারিতেন। এ-সব তাঁহার উপরি আয়ের পন্থা ছিল। সংসারের কেহই নাই, না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে—কে তাঁহার পয়সা খাইবে, তবুও রাঘব টাকা জমাইয়া যাইতেন। একটা মাটির ভাঁড়ে পয়সাকড়ি রাখিতেন, সপ্তাহে একবার বা দুইবার ভাঁড়টি উপুড় করিয়া ঢালিয়া সব পয়সাগুলি সযত্নে গুনিতেন। ভাঁড়ের মধ্যে যাহা রাখিতেন পারতপক্ষে তাহা আর বাহির করিতেন না। গ্রামের সবাই বলিত, রাঘব চক্রবর্তী হাতে বেশ দু'পয়সা গুছাইয়া লইয়াছেন।

একদিন দুপুরে পাক সারিয়া রাঘব আহারে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক-খানা ছই-ঘেরা গরুর গাড়ি আসিয়া তাঁহার উঠানে থামিল। গাড়ি হইতে একটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল। রাঘব চিনিলেন, তাঁর দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয় নন্দলাল।

নন্দলাল আসিয়া মামার পায়ের ধুলা লইল।

রাঘব বলিলেন—এস বাবা! ছই-এর মধ্যে কে?..

নন্দলাল সলজ্জমুখে বলিল—আপনার বউমা।

—ও! তা কোথায় যাবে? ঘোষ-পাড়ার দোল দেখতে বুঝি?

নন্দলাল অপ্রতিভের সুরে বলিল—আজ্ঞে না। আপনার আশ্রয়েই—আপাততঃ—মানে, বামুনহাটির বাড়িঘর তো সব গিয়েছে। গত বছর মাঘমাসে বিয়ে—তা এতদিন বাপের বাড়িতেই ছিল—সেখান থেকে না আনলে আর ভাল দেখাচ্ছে না। তাই নিয়ে আজ একেবারে এখানেই···

রাঘব বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি চিরকালই একা থাকিয়া আসিয়াছেন, একা থাকিতেই ভালবাসেন। এ আবার কোথা হইতে উপসর্গ আসিয়া জুটিল, ছাখো কাণ্ড!

যাহাহউক, আপাততঃ বিরক্তি চাপিয়া তিনি ভাগিনেয়-বধূকে নামাইয়া লইবার ও পুবদিকের ভিটার ছোট ঘরখানাতে তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে নিয়ে তো এলে, হাতে কিছু আছে-টাছে তো? আমার এখানে আবার বড় টানাটানি। ধান অন্যবার যা হয়, এবার তার সিকিও পাইনি। যজমানদের অবস্থাও এবার যা···

নন্দ এ-কথার কিছু সন্তোষজনক জবাব দিতে পারিল না।

রাঘব বলিলেন—বউমার হাতে কিছু নেই ?

—ও কোথায় পাবে! তবে বিয়ের দরুণ গয়না কিছু আছে! ওর ওই হাতবাক্সটাতে আছে যা আছে।

—জায়গা ভালো নয়। গয়নাগুলো বাক্সে রাখাই আমি বলি বেশ। পাঁচজন টের না পায়। আমি আবার থাকি গাঁয়ের এক কোণে পড়ে—আর এই তো সময় যাচ্ছে। ও-গুলো আগে সাবধানে করা দরকার।

দিন দুই পরে নন্দলাল মামাকে বলিল—আমাকে আজ একবার বেরুতে হচ্ছে মামা। একবার বীজপুরে যাবো। লোকো-কারখানায় একটা সন্ধান পেয়েছি—একটু দেখে আসি।

নন্দলাল ইতিপূর্বেও বীজপুরের কারখানায় কাজ খুঁজিয়াছে কিন্তু তেমন লেখাপড়া জানে না বলিয়া কাজ জোটাইতে পারে নাই। বলিল—লোকো-কারখানায় যদি মুণ্ডর ঠ্যাঙাতে পারি তবে এক্ষুনি কাজ জোটে, ভদ্দরলোকের ছেলে, তা তো আর পেরে উঠি নে। এই আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়তো মহেন্দ্র, তারা জেতে যুগী। সে বাইসম্যানি করছে, সাড়ে সাত টাকা হপ্তা পায়—দিব্যি আছে। কিন্তু তাদের ও-সব সয়। আমাকে বলেছিল হেড মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যাবে, তা আমার দ্বারা কি আর হাতুড়ি পিটুনো চলবে ?

পরদিন খুব ভোরে নন্দলাল বাটি আসিল। সে রাত্রেই স্টেশনে নামিয়াছিল কিন্তু অন্ধকারে এতটা পথ আসিতে না পারিয়া সেখানে শুইয়াছিল, শেষরাত্রের দিকে জ্যোৎস্না উঠিলে রওনা হইয়াছে।

নন্দলাল বাড়ি ফিরিয়া দেখিল তখনও মামা উঠেন নাই, পুবের ভিটার ঘরে স্ত্রীও তখন ঘুমাইতেছে। স্ত্রীকে জাগাইতে গিয়া দেখিল, গহনার বাক্স ঘরের মধ্যে নাই। স্ত্রীকে উঠাইয়া বলিল—গহনার বাক্স কোথায় ?

স্ত্রী অবাক হইয়া গেল। বলিল—আহা, ঠাট্টা করা হচ্ছে বুঝি ? এই তো শিয়রে এইখেনে ছিল। লুকিয়েছ বুঝি ?···

কিছুক্ষণ পরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মাথায় হাত দিয়া বসিল। ঘরের কোথাও বাক্স নাই। খোঁজাখুঁজি অনেক করা হইল। মামাও বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। চুরির কথা শুনিয়া অবাক হইলেন, নিজে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বাক্সের বা চোরের খোঁজ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশীরাও আসিল, থানাতেও খবর গেল—কিছুই হইল না।

নন্দলালের স্ত্রীর বয়স কুড়ি একুশ। রং টকটকে ফরসা, মুখ সুশ্রী, বড় শান্ত ও সরল মেয়েটি। তার বাপের বাড়ির অবস্থা বেশ ভাল, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া তার বাপ পূর্ব দুই পক্ষের সন্তানসন্ততিদিগকে এখন আর দেখিতে পারেন না। বিবাহের সময় এই গহনাগুলি তিনিই মেয়েকে দিয়াছিলেন ; এই হিসাবে দিয়াছিলেন যে, গহনাগুলি লইয়া মেয়ে যেন বাপের বাড়ির উপর সকল দাবী-দাওয়া ত্যাগ করে। পিতার কর্তব্য এইখানেই তিনি শেষ করিলেন।

নন্দলালের অবস্থা কোনো কালেই ভাল নয়, বিবাহের পর যেন তাহা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। ওই গহনা কয়খানি দাঁড়াইল সংসারের একমাত্র সম্বল। গহনাগুলির উপর নন্দলাল বার দুই ঝোঁক দিয়াছিল—একবার পাটের ব্যবসা ফাঁদিতে, আর একবার মুদীর দোকান খুলিতে সিমুরালির বাজারে। কিন্তু নন্দলালই শেষ পর্যন্ত কি ভাবিয়া দুইবারই পিছাইয়া যায়। বউও বলিয়াছিল—ছাখো ওই তো পুঁজিপাটা, আর তো নেই কিছু—যখন আর কোন উপায় থাকবে না, তখন ওতে হাত দিও। এখন থাক।

গহনার বাক্স চুরি যাওয়ার দিন পাঁচ সাত পরে একদিন নন্দলাল ভোরে উঠিয়া দেখিল স্ত্রী বিছানায় নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বউ ঘরের পাশের ছাইগাদা ঘাঁটিয়া কি দেখিতেছে! স্বামীকে দেখিয়া কেমন এক ধরনের হাসিয়া বলিল—ওগো, এসো না গো, একটু খোঁজো তো এর মধ্যে? তুমি উত্তর দিকটা থেকে ছাখো।

নন্দলাল সস্নেহে স্ত্রীকে ধরিয়া দাওয়ায় আনিয়া বসাইল। পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জল দিয়া স্নান করাইয়া দিল, নানারকমে বুঝাইল, কিন্তু সেই যে বউটির মস্তিষ্ক-বিকৃতির শুরু হইল—এ আর কিছুতেই সারানো গেল না। পাছে স্বামী বা কেহ টের পায় এই ভয়ে যখন কেউ কোনো-দিকে না থাকে, তখন চুপিচুপি ছাইগাদা হাতড়াইয়া খুঁজিয়া কি দেখিতে থাকিবে! এই একমাত্র ব্যাপার ছাড়া তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির কিন্তু অন্য কোনো লক্ষণ ছিল না। অন্যদিকে সে যেমন গৃহকর্মনিপুণা, সেবাপরায়ণা কর্মিষ্ঠা গৃহস্থ-বধূ তেমনই রহিল।

একদিন সে মামাশ্বশুরের ঘরে সকালে ঝাঁট দিতে ঢুকিয়াছে, মামাশ্বশুর রাঘব চক্রবর্তী তখন ঘরে ছিলেন না; ঘরের একটা কোণ পরিষ্কার করিবার সময় সে একখানা কাগজ সেখানে কুড়াইয়া পাইল। কে যেন দলা পাকাইয়া কাগজখানাকে কোণটাতে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কাগজখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল! এ যে তার গহনার বাক্সের তলায় পাতা ছিল, পাতলা বেগুনী রঙের কাগজ, সেকরার এই কাগজে নূতন-তৈয়ারী সোনার গহনা জড়াইয়া দেয়।...এ কাগজখানাও সেইভাবে পাওয়া, সেকরারা দোকান হইতে আসিয়াছিল, সেই হইতে তাহার গহনা বাক্সের তলায় পাতা থাকিত—সেই কোণ-ছেঁড়া বেগুনী রঙের পাতলা কাগজ-খানি!...

বউটি কাহাকেও কিছু বলিল না—স্বামীকেও নয়। মনের সন্দেহ মুখে কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে পারিল না। কিন্তু ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে তাহার খুব অসুখ হইল। জ্বর অবস্থায় নির্জন ঘরে একা বিছানায় শুইয়া তক্তপোশের একটা বাঁশের খুঁটিকে সম্বোধন করিয়া সে করজোড়ে বার বার বলিত—ওগো খুঁটি, আমি তোমার কাছে দরখাস্ত করছি, তুমি এর একটা উপায় করে দাও, পায়ে পড়ি তোমার। একটা উপায় তোমায় করতেই হবে। আর কাউকে বলতে পারি নে তোমাকেই বলছি...

বাঁশের খুঁটিটা ছাড়া তার প্রাণের এ আগ্রহ-ভরা কাতর আকুতি আর কেহই শুনিত না। কতবার রাত্রে, দিনে নির্জনে খুঁটিটার কাছে এ নিবেদন সে করিত—কি বুঝিয়া করিত সে-ই জানে।

তাহাদের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড মাঠ গঙ্গার কিনারা পর্যন্ত সবুজ ঘাসে ভরা, তারপরেই খাড়া পাড় নামিয়া গিয়া জল ছুঁইয়াছে। জল সেখানে অগভীর, চওড়াতেও হাত দশ বারো মাত্র, পরেই গঙ্গার বড় চরাটা। সারাবছরেই চরায় জলচর পক্ষীর ঝাঁক চরিয়া বেড়ায়। চরার বাহিরের গভীর বড় গঙ্গার দিকে না গিয়া তারা গঙ্গার এই ছোট অপরিসর অংশটা ঘেঁষিয়া থাকে। কার্তিকারীর বনে চরার বালি প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, বারো মাস বেগুনী ফুল ফুটিয়া নির্জন বালির চরা আলো করিয়া রাখে। মাঠে কোনো গাছপালা নাই ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠের মত সমতল ও তৃণাবৃত; দক্ষিণে ও বাঁয়ে একদিকে বড় রেলওয়ে-বাঁধটা ও অন্যদিকে দূরবর্তী গ্রামসীমার বনরেখার কোল পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই এক সারি তালগাছ এখানে ওখানে ছাড়া এই বড় মাঠটাতে অন্য কোনো গাছ চোখে পড়ে না কোনো দিকে।

এই বিশাল মাঠে প্রতিদিন সকাল হয়, সূর্য মাঝ-আকাশে দুপুরে আগুন ছড়ায়, বেলা ঢলিয়া বৈকাল নামিয়া আসে, গোধূলিতে পশ্চিম দিক কত কি রঙে রঞ্জিত হয়। চাঁদ ওঠে —সারা মাঠ চরা, রেলওয়ে বাঁধ, ও-পাশের বড় গঙ্গাটা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু কখনও কোনো কালে রাঘব চক্রবর্তী বা তাহার প্রতিবেশীরা এই সুন্দর পল্লীপ্রান্তরের প্রকৃতির লীলার মধ্যে কোনো দেবতার পুণ্য আবির্ভাব কল্পনা করেন নাই, প্রয়োজন বোধও করেন নাই—সেখানে আজ সর্বপ্রথম এই নিরক্ষরা বিকৃত-মস্তিষ্কা গ্রাম্যবধূটি বৈদিক-যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা বিদুষীর মত মনে প্রাণে খুঁটি-দেবতার আবাহন করিল।···

আমি এই মাঠেই বৈকালে দাঁড়াইয়া কথাটা ভাবিতেছিলাম। কথাটার গভীরতা সেদিন সেখানে যতটা উপলব্ধি করিয়াছিলাম, এমন আর বোধহয় কোথাও করিব না।

নন্দলাল স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। সে স্ত্রীকে ভালবাসিত; নানারকম ঔষধ, জড়ি বুটি, শিকড়-বাকড় আনিয়া স্ত্রীকে ব্যবহার করাইল। তিরোলের পাগলী-কালীর বালা পরাইল; যে যাহা বলে তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতে কিছু হয় না। একটা সুফল দেখিয়া সে খুশী হইল যে আজকাল স্ত্রী সকালে উঠিয়া ছাইগাদা হাতড়াইতে বসে না। তবুও সংসারের কাজকর্মগুলি কেমন অন্যমনস্কভাবে করে, হয়তো বা তরকারী পুড়াইয়া ধরাইয়া ফেলে, নয়তো ডালে খানিকটা বেশী নুন দেয়, ভাল করিয়া কথা বলে না—ইহাই রহিল তাহার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ।

মাস দুই কাটিয়া গেল। শ্রাবণ মাস। বর্ষার ঢল নামিয়া বড় গঙ্গা ও ছোট গঙ্গা একাকার করিয়া দিল, চর ডুবিয়া গেল। কূলে কূলে গেরিমাটির রঙের জলে ভর্তি। এই সময় নন্দলালের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিল। হাতে পূর্বে যাহা কিছু ছিল, সবই খরচ হইয়া গিয়াছে—এদিকে চাকরিও জুটিল না।

রাঘব চক্রবর্তী ভাগিনেয়কে খুঁটিনাটি লইয়া বকুনি শুরু করিলেন। ভাগিনেয়কে ডাকিয়া বলিলেন—কোনো কিছু একটা দেখে নিতে তো পারলে না। তা দিনকতক এখন না হয় বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে তুমি কলকাতার দিকে গিয়ে কাজকর্মের ভালো করে' চেষ্টা করো, নইলে আমি আর কি করে' চালাই বলো। এই তো দেখছো অবস্থা—ইত্যাদি।

নন্দলাল পড়িয়া গেল মহা বিপদে। না আছে চাকরি, না আছে কোন সম্বল—ও-দিকে অসুস্থা তরুণী-বধূ ঘরে। বীজপুরের কারখানায় কয়েকবার যাতায়াতের ফলে একজন রঙের মিস্ত্রির সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে বলিয়া কহিয়া তাহার বাসায় বউকে লইয়া গিয়া আপাততঃ তুলিল। দুইটি মাত্র ঘর, একখানা ঘরে মিস্ত্রি একলা থাকে, অন্য ঘর-খানি নন্দলালকে ছাড়িয়া দিল। মিস্ত্রি গাড়িতে অক্ষর লেখে—সে চেষ্টা করিয়া সাহেবকে ধরিয়া নন্দলালের জন্য একটা ঠিকা কাজ জুটাইয়া দিল। একটা বড় লম্বা রেক আগোগোড়া পুরানো রং উঠাইয়া নূতন রং করা হইবে, নন্দলাল জমির রং করিবার জন্য এক মাসের চুক্তিতে নিযুক্ত হইল।

রাঘব চক্রবর্তী কিছুকালের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি অনেকজন মজুর ধরিয়া বাড়ির উঠান পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। শখ করিয়া একজোড়া হরিণের চামড়ার জুতা কিনিয়া আনিলেন, এমন কি পূজার সময় একবার কাশী বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিয়া ফেলিলেন।

আশ্বিনের প্রথমে বর্ষা একটু কমিল। রাঘব চক্রবর্তী বাড়ির চারিধারে পাঁচিল গাঁথিবার মিস্ত্রী খাটাইতেছিলেন, সারাদিন পরিশ্রমের পর গঙ্গায় গা ধুইয়া আসিয়া সন্ধ্যার পরই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

অত পরিশ্রম করিবার পর তিনি শুইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘুম আদৌ আসিল না। ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টায় সারারাত্রি ছটফট করিয়া শেষ রাত্রে উঠিয়া তামাক খাইতে বসিলেন। দিনমানেও দুপুরে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই ঘুম হইল না। সারাদিনের মজুর খাটাইবার পরিশ্রমের ফলে শরীর যা গরম হইয়াছে! সেদিনও যখন রাত্রে ঘুম আসিল না, তখন পাঁচিল-গাঁথার জনমজুরকে বলিয়া দিলেন—এখন দিন দুই কাজ বন্ধ থাকুক।

পরদিন রাত্রে সামান্য কিছু আহার করিয়া ঠাণ্ডা জল মাথায় দিয়া ও হাত-পা ধুইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িলেন। প্রথমটা ঘুম না আসাতে ভাবিলেন, ঘুমের সময় এখনও ঠিক হয় নাই কিনা, তাই ঘুম আসিতেছে না। এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলেন। দশটা ···এগারোটা···বারোটা···রাঘব প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া রহিলেন, নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া শুইয়া দেখিলেন—ঘুম এখনও আসে না কেন? আরও ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল—ঘুমের চিহ্নও নাই! চাঁদ ঢলিয়া পড়িল, জানালা দিয়া যে বাতাস বহিতেছে তাহা আগেকার অপেক্ষা ঠাণ্ডা!···রাঘবের কেমন ভয় হইল—তবে বোধহয় আজও ঘুম হইবে না! ভাবিতেও বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। আজ রাত্রে না ঘুম হইলে কাল তিনি বাঁচিবেন কি করিয়া?··· উঠিয়া মাথায় আর একবার জল দিলেন—আবার শুইলেন, আবার প্রাণপণে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই ভাবিয়া তাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিল—ঘুম...ঘুম যদি না আসে! তাহা হইলে?···রাত্রি ফরসা হইয়া কাককোকিল ডাকিয়া উঠিল তখনও হতভাগ্য রাঘব চক্রবর্তী বিছানায় ছটফট করিতে করিতে ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন!

ঠিক এইভাবে কাটিয়া গেল আরও আট দিন। এই আট দিনের মধ্যে কি দিনে, কি

রাতে রাঘবের চোখে এতটুকু ঘুম আসিল না—পলকের নিমিত্ত রাঘব পাগলের মত হইলেন —যে যাহা বলিল তাহাই করিয়া দেখিলেন। ডাব খাইয়া ও পুকুরের পচা পাঁক মাথায় দিনরাত দিয়া থাকিতে থাকিতে নিউমোনিয়া হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বাঁশবেড়ের মনোহর ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখিলেন!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আরও দিন ছয় সাত কাটিয়া গেল। রাঘব সন্ধ্যার পরই হাত-পা ধুইয়া মন স্থির করিয়া শুইতে যান। কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করে—আজও বোধহয় ঘুম···

বাকীটা আর রাঘব ভাবিতে পারেন না।

রাজমিস্ত্রীর দল কাজ শেষ না করিয়াই চলিয়া গেল। উঠানে জঙ্গল বাধিয়া উঠিল। রাঘব স্নানাহার করিতে চান না, চলাফেরা করিতে চান না, সব সময়েই ঘরের দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। তামাক খাইবার রুচিও ক্রমে হারাইয়া ফেলিলেন। লোকজনের সঙ্গে ভাল করিয়া কথাবার্তা কহিতে ভালবাসেন না, পয়সার ভাঁড় উপুড় করিয়া গণিয়া দেখিবার স্পৃহাও চলিয়া গেল।

চিকিৎসা তখনও চলিতেছিল। গ্রামের বৃদ্ধ শিব কবিরাজ বলিলেন—তোমার রোগটা হয়েছে মানসিক। ঘুম হবে না এ-কথা ভাবো কেন শোবার আগে? খুব সাহস করবে, মনে মনে জোর করে' ভাববে—আজ ঘুম হবে, নিশ্চয়ই হবে, আজ ঠিক ঘুমুবো—এ রকম করে' ছাখো দিকি? আর সকাল সকাল শুতে যেও না—যে সময় যেতে, সেই সময় যাবে।

কবিরাজের পরামর্শ মত রাঘব সন্ধ্যার পর পুরানো দিনের মত রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। দাওয়ায় বসিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গানও গাহিলেন। তারপর ঠাণ্ডা জলে হাত-পা ও মাথা ধুইয়া শয়ন করিতে গেলেন। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন—আজ তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

কিন্তু বালিশে মাথা দিয়াই বুকটা কেমন যেন করিয়া উঠিল! ঘুম যদি না হয়?··· পরক্ষণেই মন হইতে সে-কথা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—নিশ্চয়ই ঘুম হইবে। পাশ ফিরিয়া পাশ-বালিশটা আঁকড়াইয়া শুইলেন। ঘরের দেওয়ালের একখানা বাঁধানো রাধাকৃষ্ণের ছবি বাতাস লাগিয়া ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতেছে দেখিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিয়া সেখানা নামাইয়া রাখিলেন। পুনরায় শুইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চোখ বুজিয়া রহিলেন। আধঘণ্টা···এক ঘণ্টা···এইবার তিনি নিশ্চয়ই ঘুমাইবেন...বুকের মধ্যে গুর্‌গুর্ করিতেছে কেন?···না, এইবার ঘুমাইবেনই।

দুই ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা।···রাত একটা, গ্রাম নিষুতি, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই—কাওরা-পাড়ায় এক আধটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছাড়া।

না—রাত বেশী হইয়াছে, আর রাঘব জাগিয়া থাকিবেন না, এইবার ঘুমাইবেন। বাঁ-দিকে শুইয়া সুবিধা হইতেছে না, হাতখানা বেকায়দায় কেমন যেন মুচড়াইয়া আছে, ডানদিক ফিরিয়া শুইবেন। ছারপোকা?···না, ছারপোকা তো বিছানায় নাই?···যাহা হউক

জায়গাটা একবার হাত বুলাইয়া লওয়া ভাল।—যাক, এইবার ঘুমাইবেন। এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত দুইটা!

কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। একটা হাট কি মেলা কোথায় যেন বসিয়াছে, রাঘব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সব লোক চলিয়া গেল, তবুও দু'দশজন এখনও হাটচালিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া শুঁটকী চিংড়ি মাছের দর কষাকষি করিতেছে—ইহারা বিদায় হইলেই রাঘব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইবেন। একটা লোক চলিয়া গেল—দুইটা—তিনটা—এখনও জন সাত লোক বাকী। রাঘব তাহাদের নিকট গিয়া চলিয়া যাইবার অনুরোধ করিতেছেন, অনুনয়বিনয় করিতেছেন, হাত জোড় করিতেছেন—তিনি একটু এইবার ঘুমাইবেন, দোহাই তাহাদের, তাহারা চলিয়া যাক্। এখনও জন তিনেক বাকী।···রাঘবের মনে উল্লাস হইল, আর বিলম্ব নাই।···এখনও দুইজন। এই দুইজন চলিয়া গেলেই ঘুমাইবেন। আর একজন মাত্র!···মিনিট পনেরো দেরী—তাহা হইলেই ঘুমাইবেন!

হঠাৎ রাঘব বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। হাট তো কোথাও বসে নাই? কিসের হাট? কোথাকার হাট? এ সব কি আবোল-তাবোল ভাবিতেছেন তিনি? ঘুম তাহা হইলে বোধ হয়···

রাঘব কথাটা ভাবিতেও সাহস করিলেন না।

কত রাত?···ওটা কিসের শব্দ?···বীজপুরের কারখানায় ভোরের বাঁশি বাজিতেছে নাকি?···সে তো রাত চারটায় বাজে। এখনই রাত চারটা বাজিল? অসম্ভব! যাক্, যথেষ্ট বাজে কথা ভাবিয়া রাত কাটাইয়াছেন। আর নয়। এইবার তিনি ঘুমাইবেন।

অল্প একটু ঘোর আসিয়াছিল কিনা কে জানে? ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে হয়তো একটু আসিতেও পারে। কিন্তু রাঘবের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এতটুকু ঘুমান নাই—চোখ চাহিয়াই ছিলেন। হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটিল। বিস্মিত রাঘব দেখিলেন, তাঁহার খাটের পাশের বাঁশের খুঁটিটা যেন ধীরে ধীরে একটা বিরাটকায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল; ব্যঙ্গের সুরে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল—মূর্খ! ঘুমোবার ইচ্ছা থাকে তো কালই গহনার বাক্স ফেরত দিস। ভাগ্নে-বউয়ের গহনা চুরি করেছিস, লজ্জা করে না?···

বীজপুরের কারখানার বাঁশির শব্দে রাঘবের ঘোর কাটিয়া গেল। ফরসা হইয়া গিয়াছে! রাঘবের বুক ধড়ফড় করিতেছে, চোখ জ্বালা করিতেছে, মাথা যেন বোঝা, শরীর ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে! না, তিনি একটুও ঘুমান নাই—এতটুকু না। বাঁশের খুঁটি-টুটি কিছু না—ও-সব মাথা গরমের দরুণ···

কিন্তু ঠিক একই স্বপ্ন রাঘব পর পর দুইদিন দেখিলেন। ঠিক একই সময়ে, ভোর রাত্রে, বীজপুরের কারখানার বাঁশি বাজিবার পূর্বে।···ঘুমাই নাই তবে স্বপ্ন কোথা হইতে আসিবে?

বীজপুরের বাসায় অন্য কেহ তখন ছিল না। নন্দলাল কাজে বাহির হইয়াছে, নন্দলালের স্ত্রী সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছিল। হঠাৎ রুক্ষ চুল, জীর্ণ চেহারায় মামাশ্বশুরকে বাসায় ঢুকিতে দেখিয়া সে বিস্মিত মুখে একবার চাহিয়াই লজ্জায় ঘোমটা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাঘব চক্রবর্তী একবার চারিদিকে চাহিয়াই কাছে আসিয়া ভাগিনেয়-বধূর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—মা তুমি মানুষ নও, তুমি কোনো ঠাকুর-দেবতা হবে। ছেলে বলে আমায় মাপ করো।

তারপর পুঁটুলি খুলিয়া সব গহনাগুলি ভাগিনেয়-বধূর হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন, কিন্তু বাসায় থাকিতে রাজি হইলেন না।

—নন্দলালের কাছে কিছু নেবার মুখ নেই আমার। তুমি মা—তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, বুঝলে না? কিন্তু তার কাছে...

ইহার মাস পাঁচ ছয় পরে রাঘব চক্রবর্তীর গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া নন্দলাল সস্ত্রীক গরুর গাড়ি করিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। ইহারা যাইবার দিন সাতেক পরে রাঘবের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার যাহা কিছু জমিজমা সব উইল করিয়া ভাগিনেয়-বধূকে দিয়া গেলেন। কিছু পোঁতা টাকার সন্ধানও দিয়া গেলেন।

নন্দলালের স্ত্রীকে কাছে বসাইয়া নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া গেলেন। বলিলেন—এই যে দেখছো ঘর, এই যে বাঁশের খুঁটি, এর মধ্যে দেবতা আছেন মা। বিশ্বাস করো আমার কথা...

ভাগিনেয়-বধূ শিহরিয়া উঠিল। সেই ঘর, সেই বাঁশের খুঁটি!...

রাঘবের মৃত্যুর পরে ষোলো-সতেরো বৎসর নন্দলাল মামার ভিটাতে সংসার পাতাইয়া বাস করিয়াছিল। বধূটি ছেলেমেয়েদের মা হইয়া সচ্ছল ঘরকন্নার গৃহিণীপনা করিতে করিতে প্রথম জীবনের দুঃখকষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খুঁটি-দেবতার কথাও ভুলিয়াছিল। হয়তো দুঃখের মধ্য দিয়া যে আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগকে জীবনে একবার মাত্র লাভ করিয়াছিল, আর কখনও জীবন-পথে তাহার সন্ধান মেলে নাই।...

বছর সতেরো পরে নন্দলালের স্ত্রী মারা গেল। নন্দলালের বড় ছেলের তখন বিবাহ হইয়াছে ও বধূ ঘরে আসিয়াছে। বিবাহের বৎসর চারেকের মধ্যে এই বউটি দুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। ক্যান্সার হইল জিহ্বায়, ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে লাগিল—কত রকম চিকিৎসা করা হইল, কিছুতে উপকার দেখা গেল না। সে শুইয়া শুইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিত, ইদানীং কথা পর্যন্ত কহিতে পারিত না। তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া সকলে তাহার মৃত্যু কামনা করিত। কিন্তু বছর কাটিয়া গেল—মৃত্যুর কোনো লক্ষণ নাই, অথচ নিজে যন্ত্রণা পাইয়া, আরও পাঁচজনকে যন্ত্রণা দিয়া সে জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া রইল।

বউটি শাশুড়ীর কাছে খুঁটি-দেবতার গল্প শোনেও নাই, জানিতও না। একদিন সে সারারাত রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। শ্রাবণ মাস। শেষরাতের দিকে ভয়ানক বৃষ্টি নামিল, ঠাণ্ডাও খুব, বাহিরে জোর বাতাসও বহিতেছিল। মাথার শিয়রে একটা কাঁসার ছোট ঘটিতে জল ছিল, এক চুমুক জল খাইয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইতেই একটু তন্দ্রা মত আসিল।

তাহার মনে হইল, পাশের খুঁটিটা আর খুঁটি নাই। তাহাদের গ্রামে শ্যামরায়ের মন্দিরের

শ্যামরায় ঠাকুর যেন সেখানে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিমুখে তাহার দিক চাহিয়া আছেন। ছেলেবেলা হইতে কতবার সে শ্যামরায়কে দেখিয়াছে, কতবার বৈকালে উঠানের বেলফুলের গাছ হইতে বেলফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া বৈকালীতে ঠাকুরের গলায় দিয়াছে। শ্যামরায়ের মূর্তি তাহার অপরিচিত নয়—তেমনি সুন্দর, সুঠাম, সুবেশ কমনীয় তরুণ দেবমূর্তি।…

বিশ্বাসে মানুষের রোগ সারে, হয়তো বধূটির তাহাই ঘটিয়াছিল। হয়তো সবটাই তার মনের কল্পনা। রাঘব চক্রবর্তী যে বিরাটকায় পুরুষ দেখিয়াছিলেন সে-ও তাঁহার অনিদ্রা-প্রসূত অনুতাপবিদ্ধ মনের সৃষ্টিমাত্র হয়তো—কারণ খুঁটির মধ্যে দেবতা সেই সেই রূপেই তাহার সম্মুখে দেখা দিয়াছিলেন, যার পক্ষে যে রূপের কল্পনা স্বাভাবিক।

সত্য মিথ্যা জানি না—কিন্তু খুঁটি দেবতা সেই হইতে এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন।

গ্রহের ফের

"গত ২২শে অগ্রহায়ণ শনিবার কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে অধ্যাপক ৺নলিনাক্ষ রায়চৌধুরীর দ্বাদশ শ্রাদ্ধবাসরীয় স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলর মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। গণ্যমান্য অনেক বক্তা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। হলটি শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে কলেজের ছাত্র সংখ্যাই অধিক। অধ্যাপক রায়চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালী জাতির গৌরব ছিলেন; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্য দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কোনো স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া উঠিল না। সভার উদ্যোগিগণের উৎসাহ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা স্বর্গত অধ্যাপক-মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার কোনো স্থায়ী ব্যবস্থার উদ্যোগ করিলে দেশবাসীর সমধিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।"—

—দৈনিক বসুমতী, ২৩শে অগ্রহায়ণ।

অধ্যাপক ৺নলিনাক্ষবাবুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হয়, বড় আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সকালে উঠে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বসুমতীর প্যারাটা পড়তে পড়তে আর একজন লোকের কথা মনে পড়ে গেল। নলিনাক্ষবাবুর মত তিনি ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন না, বর্তমান কালের তরুণদলের অনেকেই তাঁকে দেখেন নি, কারণ আজ আঠাশ বছর হোল তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু যাঁরা দেখে থাকবেন তাঁরা সেই পক্ককেশ, সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের চেহারা এখনও ভুলে যান নি নিশ্চয়ই।

আমি বলছি স্বর্গত রাজচন্দ্র সেন মহাশয়ের কথা।

নলিনাক্ষবাবু ও রাজচন্দ্রবাবু একই কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন। নলিনাক্ষবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে কেম্ব্রিজে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে

প্রেসিডেন্সি কলেজেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রাজচন্দ্রবাবু তাঁর পূর্ব থেকেই সেখানে অধ্যাপক। আমি তখন ছাত্র। মোটে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি পাড়াগাঁয়ের স্কুল থেকে এসে। ইডেন হিন্দু-হোস্টেলে থাকি। ভয়ে ভয়ে কলকাতার পথে বেড়াই, কি জানি কখন গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়ি, কি পথই হারিয়ে বসি! এত চায়ের দোকান তখন ছিল না, কলেজে স্কোয়ার অঞ্চলে দু'তিনটেই যা ছিল। জাত যাবার ভয়ে তার ত্রিসীমানায় কখনও পা দিতাম না। এ-সবের দরুণ অজ-পাড়াগেঁয়ে বলে একটা অখ্যাতিও রটে ছিল আমার নামে।

সেদিন শনিবার। বেশ মনে আছে কি একটা ছুটি উপলক্ষে আমি বাড়ি যাবো। শোনা গেল পদার্থ-বিদ্যার লেকচার-থিয়েটারে রাজচন্দ্রবাবু একটা প্রবন্ধ পড়বেন। উৎসাহে পড়ে হোস্টেলের আরও দশ জনের সঙ্গে আমিও গিয়ে গ্যালারীতে ভিড় বাধিয়ে তুললাম। খুব গোলমাল হচ্ছিল। হঠাৎ প্রবন্ধ-পাঠক বক্তৃতা মঞ্চে উঠতেই গোলমাল থেমে সব চুপ হয়ে গেল। প্রকাণ্ড মাথা ও একমুখ আধকালো, আধপাকা খাটো ঘন দাড়ি, বেঁটে চেহারা, মাথাটা দেহের অনুপাতে অত্যন্ত বড়। শ্মশ্রুযুক্ত বামনের মত চেহারাখানা। চোখ দুটোর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, চকচকে ইস্পাতের মত একটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর দীপ্তি! ফার্স্ট ইয়ার শ্রেণীর ছাত্র, উচ্চাঙ্গের গণিত বিষয়ক কোন প্রবন্ধ বোঝাবার কোনো ক্ষমতা না থাকলেও, গ্যালারীতে ছাত্রের ভিড়, কলেজের বহু অধ্যাপকের উপস্থিতি, প্রবন্ধের ভেতরকার অপরিচিত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলি ও সেগুলির উচ্চারণধ্বনি, সকলের ওপর বক্তার চেহারা—সব মিলিয়ে আমার বড় ভাল লাগলো।

তারপর আরও বক্তৃতা তাঁর শুনেছি, যত বুঝি আর না-বুঝি প্রত্যেক বারই আমার অন্ততঃ মনে হোত যে এমন একটা মনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে, যা পথে-ঘাটে সুলভ নয়। যে-ধরনের লোক পৃথিবীটার ওজন মাপে, বড় গির্জা গড়ায়, সৌর-জগতের বয়স ঠিক করে জোয়ারের সঙ্গে সময়ের সম্বন্ধ খাড়া করে, পৃথিবীর রেডিয়ম-ভাণ্ডার ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়—রাজচন্দ্রবাবুকে সেই শ্রেণীর মানুষ বলে মনে হোত। নলিনাক্ষবাবু বা রাজচন্দ্রবাবু কেউই আমাদের ক্লাসে পড়াতেন না। কলেজের তেতলার বারান্দায় কতদিন বক্তৃতা-ঘণ্টার ফাঁকে দেখতাম রাজচন্দ্রবাবু অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে চলেছেন—এ অবস্থায় অনেক সময় তিনি নিজের পড়ানোর ক্লাসটিতে যেতে ভুলে গিয়ে হঠাৎ অন্য এক অধ্যাপনারত অধ্যাপককে বিপন্ন করে তাঁর ক্লাসটিতে ঢুকে পড়তেন এবং পরক্ষণেই চমক ভেঙে অস্ফুটস্বরে কি বলেই সে ঘর থেকে বার হয়ে পড়তেন। ছেলেরা বলাবলি করতো, তিনি সব সময় গণিতের উঁচু বিষয় চিন্তা করেন, পৃথিবীর মাটির খবর রাখেন না।

তা না রাখুন তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু রাজচন্দ্রবাবু উপরওয়ালার মেজাজের খবরটাও বড় একটা রাখতেন না বা রাখার জন্যে গ্রাহ্যও করতেন না। এটাই ছিল তাঁর মহৎ দোষ। প্রিন্সিপাল লসন সাহেবের নাম প্রেসিডেন্সি কলেজের সে সময়ের ছাত্রদের কাছে আর দুবার বলবার দরকার হবে না—খুব ভাল লোক, দর্শন ট্রাইপসে জয়পতাকা উড়িয়ে পাস! সুতরাং

শুধু হাকিমী চালচলনের প্রিন্সিপাল নন, বিদ্বানও বটে। তিনি রাজচন্দ্রবাবুকে অনেক রেহাই দিয়ে চলতেন। কিন্তু নিজের ডিপার্টমেণ্টের উপরওয়ালা নলিনাক্ষবাবুর সঙ্গে রাজচন্দ্রবাবুর বনিবনাও ছিল না আদৌ। কতদিন ছেলেরা দেখেছে, নলিনাক্ষবাবুর খাসকামরা থেকে রাজচন্দ্রবাবু অপ্রসন্ন মনে বিড় বিড় করে কি বকতে বকতে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে দুঁদে সওয়ারের পাল্লায়-পড়া বিপন্ন একরোখা ঘোড়ার ভঙ্গিতে বার হয়ে গেলেন। নলিনাক্ষবাবুর হুকুম ঠিক মত তামিল না করার মূলে রাজচন্দ্রবাবুর যে ইচ্ছাকৃত কোনো অবিনয় ছিল তা নয় বোধহয়—তাঁর স্বভাবই ছিল সাধারণতঃ অন্যমনস্ক ধরনের। নলিনাক্ষবাবু অধস্তন কর্মচারীর এ রকম লর্ড কেলভিনের মত মেজাজ বরদাস্ত না করতে পেরে এবং সেটাকে তাঁর হুকুমের প্রতি সরাসরি ভাবের অমান্য ভেবে নিয়ে, সব সময় পঞ্চমে চড়ে থাকতেন।

আমার সহপাঠী প্রতুল হোস্টেলে আমার পাশের ঘরেই থাকতো। অঙ্কে খুব পাকা, হুগলী জেলা থেকে টেম্পল বৃত্তি নিয়ে এণ্ট্রান্স পাস করে। চেহারা বেশ ভাল, আর একটু সেণ্টিমেণ্টাল ধরনের ছিল বলে' তাকে সকলে 'মিস্ গুপ্ত' বলে' ডাকতো। সেদিন সন্ধ্যার সময় সে হোস্টেলের বারান্দায় বসে আমার কাছে গল্প বললে, বিকালে রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ি গিয়েছিল। সেখান থেকেই আসছে। আমি জানতাম, কলেজে যে সব ছেলে মুগ্ধ ভক্তের অর্ঘ্য নিবেদন করে প্রতুল সে-দলের একজন চাঁই। যেমন হয়ে থাকে কলেজে, ছেলেরা যে প্রফেসারকে পছন্দ করে, তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমায়। প্রতুলও তারপর থেকে সপ্তাহে দুদিন তিনদিন রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ি যাতায়াত শুরু ক'রে দিলে।...একমাত্র মেয়ে ছাড়া তাঁর সংসারে কেউ নেই, বা তাঁর মেয়ের নাম যে প্রভাবতী, এ-সব কথা আমি ঐ প্রতুলের মুখেই শুনেছিলাম। প্রতুলের মুখেই শুনতাম তাঁর বাড়িতে চায়ের বন্দোবস্ত ছিল না, কারণ তিনি নিজে চা খান না—ছেলেরা যাতায়াত শুরু করার পরে প্রভাবতী বাবাকে বলে চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়ে নিয়েছেন—নিজে চা পরিবেশন করেন, কাজেই আজকাল এদের—বিশেষ করে প্রতুলের কোনো অসুবিধা হয় না।

হঠাৎ একদিন মনে হোল রাজচন্দ্রবাবুর বাড়ি না-যাওয়াটা তাঁর প্রতি অত্যন্ত অসম্মান ও ঔদাসীন্য দেখানো হচ্ছে। উঁহু—সেটা ঠিক নয়। পরের রবিবার প্রতুলের সঙ্গে বিকেলের দিকে তাঁর ওখানে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। রাজচন্দ্রবাবু তখনও ওপরে নিজের ঘরটিতে পড়াশুনায় ব্যস্ত আছেন। তাঁর মেয়ে আমাদের বসালেন, চা ও খাবার তৈরী হোল, খানিকক্ষণ গল্পসল্পও হোল। তাঁর কথাবার্তায় মনে হোল রাজচন্দ্রবাবু অন্য বিষয়ে যতই অন্যমনস্ক হোন না কেন, মেয়েটির শিক্ষা দেওয়া বিষয়ে মোটেই ঔদাসীন্য দেখান নি।

তারপর আমরা ওপরের ঘরে গেলাম। আগাগোড়া দেওয়াল বইভরা আলমারীতে ঢাকা পড়েছে। মেজের ওপর এখানে ওখানে যদৃচ্ছামত বই ছড়ানো। দেখে মনে হয় আলমারী-ভরা বই শুধু ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। দিস্তা দিস্তা সাদা কাগজে লম্বা লম্বা আঁকজোক ভরা তক্তপোশের ওপর, টেবিলে ছড়ানো "f" অক্ষরের বাড়াবাড়ি খুব, অনধি-

কারীকে যেন চাবুক উঁচিয়ে তাড়া করে আসছে। দেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যক্ষদের সঙ্গে রাজচন্দ্রবাবুর পত্র-ব্যবহার হয় বা তাঁদের দু' একজনের সঙ্গে পরিচয় যে খুব ঘনিষ্ঠ তাও রাজচন্দ্রবাবুর অনুপস্থিতির ফাঁকে প্রতুল খানকতক চিঠি দেখিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে। হোস্টেলে এসে গল্পের সময় তাঁদের মধ্যে হেনরী রবার্টসন্ ও হ্যারল্ড জেফ্রিস্—দু'টো নাম শুনে একজন এম্-এ শ্রেণীর গণিতের ছাত্র বললে, বর্তমান কালে এঁরা নাকি গণিতের দুই দিক্‌পাল।

কলেজে নলিনাক্ষবাবু "On ইত্যাদি ইত্যাদি" নামক এক দুর্বোধ্য প্রবন্ধ পাঠ করলেন। প্রিন্সিপাল তখন ছিলেন সভাপতি। অন্যান্য অধ্যাপক ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। গণিতের অধ্যাপকেরা প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটা একবার দেখবার জন্যে, নলিনাক্ষবাবু বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামলেই কাড়াকাড়ি শুরু করলেন। কেবল রাজচন্দ্রবাবুর কোনো উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল না। তিনি নাকি, প্রতুল শুনে এল, বাড়িতে বলেছেন—নলিনাক্ষবাবু প্রবন্ধের অধিকাংশই ভিত্তিহীন। অত অসম্পূর্ণ data-র ওপর নলিনাক্ষবাবুর মত বিচক্ষণ লোক যে কি করে তাঁর বক্তব্য খাড়া করেছেন তা ভেবে রাজচন্দ্রবাবু আশ্চর্য হয়ে গেছেন—ইত্যাদি।

এর মাস পাঁচেক পরে Philosophical Magazine-এ রাজচন্দ্রবাবুর একটা প্রবন্ধ বার হোল। তাতে শুনলাম, তিনি নলিনাক্ষবাবুর মতবাদকে খণ্ডন করেছেন, যদিও নলিনাক্ষ-বাবুর প্রবন্ধের উল্লেখ কোথাও তিনি করেন নি। প্রতুল কলেজের লাইব্রেরীতে দেখালে, অক্সফোর্ডের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক O'sullivan তাঁর Geometry of Hyper-Spaces সংক্রান্ত নূতন বইয়ে অধ্যাপক সেনের অনুসন্ধানের যথেষ্ট সাহায্য নিয়েছেন এবং গণিতের এই নূতন শাখায় অধ্যাপক সেন যে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন—মনীষী অধ্যাপক সে-কথা নিজ গ্রন্থের যথাস্থানে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন।

একদিন রাজচন্দ্রবাবুর বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ হোল। প্রভাবতীর হাতের রন্ধনের প্রশংসা এর আগে প্রতুল দু'একদিন করেছিল বটে—খুব যে বাড়িয়ে বলেছিল তা মনে হোল না। প্রভাবতী আমাদের সঙ্গে যত শান্ত, অসঙ্কোচ ও সহজ ব্যবহার করতেন ততই আমাদের, বিশেষ করে আমার আনাড়ি ভাবটা যেন বেড়েই চলেছিল ; কোন রকমে নিমন্ত্রিতের কর্তব্য সমাপ্ত করার পর রাজচন্দ্রবাবুর আহ্বানে তাঁর ঘরে গেলাম। ঘরে টেবিল চেয়ার তত ছিল না। তিনি তাকিয়া ঠেস দিয়ে তক্তপোশের ওপর বসে আরাম করছিলেন। কথায় কথায় বললেন—ওহে, একটা জিনিস বার করে' ফেলেছি। ঠিক তিন বৎসর পরে একটা ধূমকেতু আসছে—এটা জানাশোনা বা তোমাদের ক্যাটালগের বাইরের জিনিস—এটা হয় আসছে প্রথমবার নয়তো অনেকদিন পরে। ঠিক তিন বছর পরে আমাদের আকাশে দেখা যাবে। তারপর তিনি জানালেন, অন্য একটা বিষয়ের অনুসন্ধান করতে এই ধূমকেতুর আসবার সন্ধান তিনি পেয়েছেন—তবে এটা ঠিক যে বৈজ্ঞানিকদের তালিকাভুক্ত ধূমকেতু তা নয়।

একটা কিসের বন্ধে ছুটি হোল। হয়তো গ্রীষ্মের হবে, ঠিক মনে নেই। অনেকদিন পর

দেশ থেকে কলকাতায় এসেছি। ছুটির সময় রাজচন্দ্রবাবু তাঁর দেশ ঢাকা জেলায় চলে যেতেন তা জানতাম। এসেছেন কিনা দেখতে তাঁদের বাসায় গেলাম। প্রভাবতীকে দেখতে পেলাম না। বাড়িতে অন্য কোন চাকর-বাকরও ছিল না—সকালে ওপরের ঘরে আছেন ভেবে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে রাজচন্দ্রবাবুর ঘরে ঢুকতেই দেখলাম, তিনি একমনে কি লিখছেন—মুখ তুলে আমাকে দেখেই রুক্ষস্বরে গরম মেজাজে বলে উঠলেন—কে?···যাও যাও, যাও যাও···

কথা শেষ না করেই যেন মনে হোল, তক্তপোশ থেকে কি যেন একটা তুলে ছুঁড়ে মারতে গেলেন।

হঠাৎ পেছন থেকে চোখ টিপে ধরলে, মানুষ যেমন অতর্কিতভাবে হতভম্ব হয়ে পড়ে—সেই রকম হয়ে পিছু হটে রাজচন্দ্রবাবুর ঘর থেকে বার হয়ে এলাম। পরে কাঠের পুতুলের মত মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে গিয়েই দেখি, প্রভাবতী উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে—বোধহয় চীৎকার শুনে তিনি এইমাত্র নিচে থেকে ছুটে উঠে আসছিলেন। আমাকে দেখে শুষ্কমুখে বললেন—আসুন, নিচে আসুন অমলবাবু। দেশ থেকে কবে এলেন?

আমার বিস্ময় তখনও যায় নি, কথার উত্তর খুঁজে দিতে দেখি তাঁর চোখ দুটি জলে ভরা। বললেন—আজ মাসখানেক হোল বাবা ওই রকম হয়েছেন—এক আমি ছাড়া কেউ কাছে যেতে পারে না। খান না, শোন্ না—কি সব অঙ্ক কষেন বসে বসে রাতদিন। মাথা একেবারে ঠিক নেই—ছুটিতে দেশে যাওয়া হয় নি। কি যে হবে অমলবাবু।

তাঁকে যথেষ্ট সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে সেদিন হোস্টেলে ফিরলাম। তারপর কয়েকমাস প্রতুল ও আমি রাজচন্দ্রবাবুর ওখানে প্রায়ই যেতাম। তাঁদের দেশ থেকেও প্রভাবতীর বড়-মামা এসে কিছুদিন থাকলেন।

কলেজে তাঁর চাকরি আর বেশীদিন থাকা সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। দিন দিন তাঁর অপ্রকৃতিস্থতা যেন পরিস্ফুট হয়ে বেড়ে যেতে লাগলো। বেচারী নলিনাক্ষবাবু প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই তাঁকে সামলাতে হিম্‌সিম্ খেতেন, এ অবস্থায় তো হাল ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রিন্সি-পালের কাছে লম্বা লম্বা নোট পাঠাতে লাগলেন। চাকরিতে দীর্ঘদিনব্যাপী ছুটি নিয়ে নিয়ে শেষে ইস্তফা দিতে হোল।

তারপর কলকাতার বাস উঠিয়ে তাঁরা চলে গেলেন শিবপুর ব্যাটরা অঞ্চলে। সেখান থেকে চলে গেলেন চন্দননগরে গঙ্গার ধারে একটা ছোট বাড়িতে।

ইতিমধ্যে প্রতুল একবার সেখানে গিয়েছিল। ফিরে এসে বললে, তাঁরা সামান্যভাবে আছেন, খড়ের বাংলো ঘরে থাকেন। রাজচন্দ্রবাবু অনেকটা ভাল আছেন। কলকাতার বাইরে গিয়ে অনেকটা সুস্থ হয়েছেন আজকাল। রোজ সন্ধ্যার আগে গঙ্গার ধারে খুব বেড়ান, কোনো কোনো দিন গ্রামের বাইরের মাঠে গিয়ে এক জায়গায় বসে বসে ওয়াটার-কলার ছবি আঁকেন শুনলাম। এ সংবাদটা নতুন এবং অদ্ভুত লাগলো। তুলি ও ইজেল হাতে রাজচন্দ্রবাবুর ছবিটা মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলাম না কোনো রকমে। ডাক্তারের

পরামর্শে অবসর সময়ে চিত্রবিদ্যার চর্চা আরম্ভ করেছেন, গণিতের কেতাব সব আলমারীর মধ্যে চাবি বন্ধ!

পুজোর ছুটিতে তাঁদের ওখানে গেলাম। প্রভাবতী ভারী আনন্দ প্রকাশ করলেন। রাজচন্দ্রবাবুকে অনেক সুস্থ বলে মনে হোল বটে, কিন্তু আগেকার মত যেন দেখলাম না।

রাজচন্দ্রবাবু বললেন—ওহে, তোমরা ধূমকেতুটার কথা ভুলে যাওনি তো?...ওটা আসছে কিন্তু ঠিক···

আমি বললাম—আগে এটা এসেছিল কখনো?

রাজচন্দ্রবাবু বললেন—এসেছিল নিশ্চয়ই, তবে অনেকদিন আগে। মানুষ তখন শিশু ছিল। প্যারাবোলার পথে ঘুরতে—বড় প্যারাবোলার পথে ঘুরে আসতে অনেক বছর কেটে গিয়েছে··

আমি না বুঝিতে পেরে বললাম—প্যারাবোলায় ঘুরলে সেটা কি ফিরে আসবে আবার—

তিনি বললেন—কেন আসবে না? বড় প্যারাবোলা আর কিছু না—Ellipse-ই—তবে চ্যাপ্টা খুব বেশী, যাকে বলে Eccentricity খুব বেশী। অন্য ধূমকেতুর পথ ছোট Ellipse, মানুষের জ্ঞানের মধ্যেই হয়তো দু'বার আসতে পারে—হতে পারে এর পথ ঘুরতে লেগেছে পাঁচ হাজার কি দশ হাজার বছর।—দশ হাজার বছর আগে যখন এসেছিল তা মানুষের ইতিহাসের বাইরে···

তারপর সরল বৃদ্ধ অপ্রতিহতভাবে বললেন—ওহে, এটা তোমরা দাও না কাগজে-টাগজে লিখে! তারপরই তাঁর সেই প্রাণ খোলা হাসি।

কলকাতায় ফিরে খুব হইচই করা গেল। রাজচন্দ্রবাবুর লেখা এক চিঠি নিয়ে এলাম বঙ্গবাসীর সম্পাদকের নামে। বঙ্গবাসী তখন নামজাদা পয়সাওয়ালা কাগজ! বঙ্গবাসীতে বড় শিরোনামা ফেঁদে কথাটা ছাপা হোল। ক্রমে হিতবাদী, বসুমতী, ঢাকাপ্রকাশ, তখনকার সব বড় কাগজেই কথাটা ছড়িয়ে গেল।

তখনও অবশ্য তিন বৎসর বাকী। কথাটা দু' একবার আলোচনা হয়েই থেমে গেল।

তারপর কি হোল, সে-কথা এখনও বোধহয় অনেকে ভুলে যাননি। তখন রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়। জাপানীরা পর পর চেষ্টা করেও পোর্ট আর্থার দখল করতে পারছে না। জেনারেল স্টোশেল বন্দরের মধ্যে ইঁদুর-কলে আটকা পড়েছেন—ও-দিকে বাল্‌টিক-বন্দর চলে আসছে নৌ-সেনাধ্যক্ষ রোজডেস্টভন্স্কির অধীনে! স্পেনের গ্যালিসিয়া প্রদেশের বন্দরটাতে কয়লা নিতে গিয়ে বন্দরের কর্তৃপক্ষদের অদূরদর্শিতার ফলে যে গোলমাল সৃষ্টি হয়েছিল, কাগজওয়ালারা তা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে। সকলে বলছে, এইবার একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের সূত্রপাত না হয়ে আর যায় না। লোকে ভারী খুশী আছে, অনেকে রাত্রে ভাল করে ঘুমোয় না।

এমন সময় সংবাদ এল, স্পেনের সঙ্গে সে-বিবাদ রুশ মিটিয়ে ফেলেছে ইংরেজের মধ্যস্থতায়। অনেক হুজুগী লোক বড় আশাভঙ্গ হয়ে একেবারে শয্যাগ্রহণ করলো।

ঠিক এই সময়ে এই ধূমকেতুর আবির্ভাব যেন সংবাদপত্র-গগনে হৈ-হৈ পড়ে' গেল। যেদিন আসবার দিন কাগজে ছাপা হয়েছিল সেদিনের কথা এখনো অনেকেরই নিশ্চয় মনে আছে। সেদিন রবিবার, ৭ই জুন। সন্ধ্যার অনেক আগে থেকেই লোক ছাদে স্থান গ্রহণ করে' দাঁড়িয়ে রইলো। ভাল করে' দেখতে পাওয়া যাবে বলে' অনেকে কলকাতার বাইরে চলে' গেল। নতুন অপেরা-গ্লাসের কাটতি 'লরেন্স ও মেয়োর' দোকানে খুব বেড়ে গেল। বঙ্গবাসী ও সন্ধ্যা কাগজে রাজচন্দ্রবাবুর ছবি বেরুলো। উৎসাহী দু' একখানা কাগজ তাঁর সংক্ষিপ্ত কাল্পনিক জীবন-কথাও লিখে ফেললে। বিদ্যুতের ট্রাম তখন কলকাতায় নতুন হয়েছে —মোড়ের ওপর ট্রামযাত্রীদের কাছে দৈনিক বঙ্গ-সুহৃৎ খুব বিক্রি হয়ে গেল—তারা উৎসাহের আতিশয্যে আগন্তুক ধূমকেতুর ছবিটা পর্যন্ত দিয়ে দিল।

এরকমও একটা গুজব রটেছিল যে, ধূমকেতুর পুচ্ছটার সঙ্গে একটা বিরাট ধাক্কা খেয়ে পৃথিবীটা একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। এই সংবাদটা দু' একটা হিন্দী কাগজে রটে যাওয়ায় মাড়োয়ারীরা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা ওঠাতে শুরু করে' দিলে। একটা ছোট নতুন স্বদেশী ব্যাঙ্ক একদিনে দশটা থেকে ছ'টার মধ্যে একলক্ষ ষাট হাজার টাকা নগদ আদায় দিয়ে লাল-বাতি জ্বালাবার যোগাড় করে' তুললে। কিন্তু এক দুর্বোধ্য যুক্তিবলে সকলেই ঠাওরে নিলে, ধূমকেতুর লেজের ধাক্কায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক চুরমার হয়ে গেলেও তাদের লোহার সিন্দুকগুলো প্রাণে বেঁচে যাবে।

আমি তখন আর হোস্টেলে থাকি না, বহুবাজারের মোড়ে একটা মেসে থাকি। সন্ধ্যার সময় প্রতুল আমার বাসায় এল। দু'জনে ছাদে উঠলাম। আশে-পাশের ছাদ লোকে লোকারণ্য। ভীমনাগের সন্দেশের দোকান বন্ধ, ফুলওয়ালাদের দোকান বন্ধ, সেদিন তারা ছাদ ভাড়া দিয়েছে। ক্রমে বেশ অন্ধকার হোল। তখনও ধূমকেতুর কোনো সন্ধান নেই। রাত্রি আটটা বেজে গেল। নটা—দশটা—এগারোটা। ভিড় ক্রমে পাতলা হয়ে এল। ফুল-ওয়ালারা মাল কাটাবার জন্যে অগত্যা অর্ধেক দরে মালা বিক্রি করতে লাগলো। আরও রাত হোল—কিন্তু কিছু হোল না।

প্রতুল আমায় বললে—এখন না, শেষ রাত্রের দিকে উঠবে···

সারা রাত্রির মধ্যে অনেকে মাঝে মাঝে ছাদে উঠে দেখতে লাগলো। সে-রাত্রে অনেকেরই ঘুম হোল না। কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পেল না।

তার পরে আজকাল করে' এক সপ্তাহ, ক্রমে দু'সপ্তাহ কেটে গেল, ধাক্কা খাবার ভয়ে যারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল তারা আশ্বস্ত হোল, ধাক্কা তো দূরের কথা—ধূমকেতুর পুচ্ছের একটা পালকও কারুর নজরে এল না।

কলেজে খুব হাসাহাসি হোল। নলিনাক্ষবাবু এতদিন চুপ করে' ছিলেন, বোধহয় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর গণিতের প্রতিভার ওপর গোপনে গোপনে তিনি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। এবার তিনি ক্লাসে এসে বললেন, (তখন তিনি আমাদের পড়ান) যে, পূর্ব থেকেই তিনি জানতেন ও কিছু নয়। রাজচন্দ্রবাবুর মত বিচক্ষণ লোক যে কি data-র ওপর এ আজগুবি খবর খাড়া করলেন

তা তিনি ভেবে আশ্চর্য হয়েছিলেন ; তবে পাছে অশোভন হয় এজন্য কোন কথা বলেন নি। এমন কথারও আভাস দিলেন যে রাজচন্দ্রবাবুর মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না হওয়ার দরুণই এই সব গোলযোগ এবং তাঁকে নিবৃত্ত না-করার দরুণ আমাদের মৃদু ভর্ৎসনাও করলেন।

এ ক্ষেত্রে যা হয় তাই হতে লাগলো। কাগজপত্রে, লোকের মুখে খুব গালাগালি চললো। নিরীহ রাজচন্দ্রবাবু কারুর কোন অনিষ্ট করেন নি, বরং ধূমকেতুর ধাক্কা খাওয়ার দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচিয়ে লোকের ইষ্টই করেছিলেন—কিন্তু আমাদের একটা বৃহৎ আশা দিয়ে তা থেকে বঞ্চিত করার অপরাধে তাঁকে কেউ ক্ষমা করলে না। স্টেট্‌স্‌ম্যান, ইংলিসম্যান মুচকে হাসলে। যে কাগজে ধূমকেতুর ছবি বেরিয়েছিল, তারা ভালমানুষটি সেজে ধূমকেতুর আসা না-আসা সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করলে না। কলেজের নোটিশ বোর্ডে রাজচন্দ্রবাবুর ভক্তের বিপক্ষদলেরা খড়ি দিয়ে একটা ছবি আঁকলে···

দিন কুড়ি পরে প্রভাবতীর পত্র পেলাম, রাজচন্দ্রবাবুর অত্যন্ত অসুখ, একবার আসবেন। —অত্যন্ত অনুরোধ করেছেন।

প্রতুল ও আমি রাজচন্দ্রবাবুকে দেখতে গেলাম। তখন বৃদ্ধ একেবারে শয্যাগত, জ্ঞান নেই। প্রভাবতীর মুখে শোনা গেল, ক'দিন ধরে' বৃদ্ধ অনবরত আঁকজোক কষেছেন—তারপরই হঠাৎ ঘাড়ে ও পিঠে ব্যথা হয় এবং রাত্রে খুব জ্বর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ডাক্তার মত দিয়েছেন, অতিরিক্ত মস্তিষ্কচালনার ফলেই এরূপ দাঁড়িয়েছে।

আমরা যাওয়ার তিনদিন পরে বৃদ্ধের অবস্থা আগের চেয়ে একটু ভাল হোল। সন্ধ্যার ঠিক আগে তাঁর বিছানার পাশের খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তিনি বালিশ ঠেস্ দিয়ে বসেছিলেন। প্রভাবতী, আমি, প্রতুল ও আরো দু'জন ছাত্র—আমরা সকলে তাঁর বিছানার পাশেই বসেছিলাম। হঠাৎ বৃদ্ধ ধীর ভাবে বললেন—ওটা আসছে—আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, প্রকাণ্ড Parabola-র পথে ঘুরে আসছে—আকাশের দিকে চোখ চেয়েই আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি।

পরদিন প্রতুল সকালে আমার কাছে এল। বললে—একটা কথা আছে শোনো। তারপর সে বললে—অনেক রাত্রে রাজচন্দ্রবাবুর বিছানার পাশে প্রভাবতী জেগে বসেছিলেন, বৃদ্ধ মেয়েকে বলেছেন—তুমি সকলকে বলে' দিও হিসাব কষ্‌তে আমার পঁয়তাল্লিশ দিনের ভুল হয়েছে—আমি যেদিন বলেছিলাম তার পঁয়তাল্লিশ দিন পরে ধূমকেতু ঠিক আসবে। কোন ভুল নেই, আসতেই হবে। বলে দিও ছেলেদের।···প্রভাবতী এ-কথা প্রকাশ করেছেন মাত্র, কিন্তু বৃদ্ধের কথা প্রলাপ কি সুস্থ মনের উক্তি না বুঝতে পেরে, কথার ওপর কোনো আস্থা স্থাপন করেন নি।

সেদিন শেষ রাত্রে বৃদ্ধের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে এল, দুপুরের পর তিনি মারা গেলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে আমরা পরামর্শ করলাম, এ-কথা আর প্রকাশ করবার উপায় নেই—মৃত ব্যক্তির শিরে আর বিদ্রূপ বর্ষণ করার আয়োজন করে' কি হবে? প্রতুলের মত মুগ্ধ ভক্ত রাজচন্দ্রবাবুর ছাত্রদের মধ্যে আর কেউ ছিল কিনা জানি না। সেও

কিন্তু আমার প্রস্তাবে রাজী হোল। প্রিন্সিপ্যাল লসন সাহেব কলেজ একদিন বন্ধ রাখলেন।

আরও কুড়ি দিন কেটে গেল। পঁয়তাল্লিশ দিনের দিন মনের মধ্যে এমন একটা অদম্য কৌতূহল সকাল থেকেই শুরু হোল, যে, কোনো রকমে অন্যমনস্ক না হোলে সময় কাটানো অত্যন্ত কষ্টকর হোত বিবেচনা করেই সন্ধ্যার পর আমি থিয়েটার দেখতে গেলাম। দর্শকগণের উল্লাসের ও করতালির গণ্ডগোলের মধ্যেও কথাটা কেবলই আমার মনের মধ্যে যাতায়াত করতে লাগলো।

রাত্রি বারোটার পর মেসে ফিরে এলাম। আস্তে আস্তে ছাদে উঠে প্রতুলকে বললাম—চলে' আয় ভাই, নেমে আয়। রাত অনেক হয়েছে।

অনেকক্ষণ থেকে সে ছাদের ওপর হাঁ করে' ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রতুলের চোখে জল এল। লোকে তাকে যতই সেন্টিমেন্টাল্ বলুক, নলিনাক্ষবাবুকে মনে মনে কৃপার পাত্র ভাবলাম সে রাত্রে, এ-রকম একজন মুগ্ধ একনিষ্ঠ ভক্ত ছাত্র লাভ করার সুযোগ তাঁর হয়নি বলে'—উঠুন গিয়ে তিনি ইম্পিরিয়াল গ্রেডে।

কত রাত্রে জানি না···

কে ডাকছে—অমল···অমল···

ঘুম ভেঙে গেল। মেসের চার পাঁচজন ছেলে ব্যস্তভাবে বললে, শীগগির এসো ছাদে—একেবারে তেতলায় চলো। প্রতুলকেও তারা ডেকে ওঠালে।

প্রতুল ভূতগ্রস্তের মত দৌড়ে ছাদে উঠলো।

রাত্রি তিনটের সময়। নৈর্ঋত কোণ আলো হয়ে উঠেছে। দূরে গোলতলার মিশনারী স্কুলটার মাথার ওপর দিয়ে, আকাশের সেইদিকটা আলো করে' তুলে Astronomy-র পাঠা-কেতাবের ছবির মত অবিকল প্রকাণ্ড ধূমকেতু।···তবে পুচ্ছটা যেন একটু বাঁকা—ঠিক সোজা নয়, আর ঠিক পাশাপাশি দৃষ্টি না পড়ায়, একটু চ্যাপ্টা গোছের দেখাচ্ছে।···গোল অংশটা আমাদের দিকে ফেরানো, আর বাঁকা ঝাঁটার মত পুচ্ছটা মিশনারী স্কুলের ছাদ ছাড়িয়ে ধর্মতলার গির্জার দিকে প্রসারিত।···

১৯০৪ সালের সে-কথা এখনও অনেকে ভুলে যান নি। আবার কি রকম হইচই হোল, সব কাগজে কি ভাবে রাজচন্দ্রবাবুর ছবি বেরুলো, স্টেট্স্‌ম্যান সামলে নিয়ে কি কথা লিখলে! —কলেজে প্রিন্সিপ্যাল লসন সাহেব সমস্ত ছেলে ও প্রোফেসার নিয়ে এক সভায় মৃত-আত্মার কি-রকম সম্মান করলেন—সে-আমলের ছাত্রেরা অনেকেই তা' এখনও ভোলে নি।

তারপর প্রতিরাত্রে প্রায় ক'মাস ধরে'ধূমকেতু ক্রমেনিকট থেকে, নিকটে আসতে লাগলো। পুচ্ছটা ক্রমে এক দিকে বেঁকে যেতে লাগলো—কিন্তু মাঝ-আকাশ ছুঁয়ে গেল না—নৈর্ঋত কোণ থেকে বায় হয়ে একমাস এগারো দিন পরে ঈশান কোণ কেটে বেরিয়ে চলে' গেল।

কোন্ অনন্ত থেকে কোন্ বিশাল কক্ষ-পথে ঘুরে আসছে জানি না—এই প্রথম না এর আগে এসেছিল তাও জানা যায় নি। হয়তো শেষ যখন এসেছিল, আদিম-যুগের বিশাল

সমুদ্র তখন জনহীন আদিম-কালের পৃথিবীর বুকে দুলতো···সৃষ্টির তখন সবে শুরু...উত্তাল অগ্নিস্রোত কম্পমান পৃথিবী বাষ্পভরা নির্জন আকাশে বহুদূরাগত তার প্রিয় সন্তানদের স্বপ্ন ভাখে···

আবার যখন আসবে ফিরে—হয়তো দশ হাজার বৎসর পরের কোন্ তরুণ-যুগের মানুষেরা তখন তরুণ-দৃষ্টি মেলে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখবে নতুন আশা, বল ও উৎসাহ নিয়ে। কে জানে?...

যে জানতো—সেও এই ধূমকেতুর মতই অনন্তে মিলিয়ে গিয়েছে—তবে ধূমকেতুটা হয়তো আবার ফিরে আসবে—কিন্তু সে-মানুষটি আর ফিরবে না।

বসুমতীর প্যারাটা পড়তে পড়তে এই সব পুরানো কথাই মনে এল নতুন করে'!

মরীচিকা

কাল রাত্রে গ্রামের লোকের ঘুম হয় নাই ভাল।

আজ চাটুয্যে-গিন্নীর নাৎনীকে দেখিতে আসিবার দিন। গ্রামসুদ্ধ মেয়েপুরুষ সেখানে আজ নিমন্ত্রিত।

কিন্তু শুধু নিমন্ত্রণের আনন্দই যে এদের ঘুম না-হইবার একমাত্র কারণ, তাহা নয়। ছোট্ট গাঁ, সবসুদ্ধ ঘর পঞ্চাশেক লোকের বাস। কেহ বিদেশে যায় না, চাকুরি করে না, করিবার দরকারও নাই। সামান্য জমিজমাটুকু নাড়িয়া চাড়িয়া প্রত্যেকে একরকম দিনপাত করে। কুলবেড়ে গ্রামের বাহিরে যে বড় জগৎটা আছে, সে-সম্বন্ধে কেহ কিছু জানেও না, জানিবার জন্য মাথাও ঘামায় না। তাই কাল যখন জানা গেল, চাটুয্যে-বাড়িতে মেয়ে দেখিতে যে আসিতেছে, সে কলিকাতার ছেলে ও কলেজে শিক্ষিত, তখন এই অদৃষ্টপূর্ব জীবটিকে দেখিবার ও তাহার সহিত কথাবার্তা কহিবার আনন্দটা, খাওয়ার আনন্দকেও ছাপাইয়া উঠিল। তাছাড়া যে বর, সে-ই স্বয়ং আসিতেছে নিজের চোখে পাত্রী দেখিতে—আজকালকার ছেলের ভাই ধরন। রেলের স্টেশনে শেষরাত্রে গরুর গাড়ি গিয়াছে। বেলা দশটার মধ্যে এখানে পৌঁছাইয়া যাইবে। রায়-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে একদিকে ভূষির বস্তা ও বিচালীর স্তূপ সরাইয়া নূতন মাদুর পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে, কারণ চাটুয্যে-বাড়িতে বাহিরের বসিবার ঘর নাই। পাত্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গ্রামের শখের যাত্রাদলের ছেলেরা কয়দিন হইতে গান-বাজনার তালিম দিয়াছে; একটি ছোক্‌রা মামার-বাড়ি বেড়াইতে গিয়া কলের গানে রিজিয়া ও বক্তিয়ারের অভিনয় শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিল—গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে বহুবার শুনাইয়াছে—আজ সেও একবার কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য অধীর হইয়া আছে।

সকাল হইতেই চণ্ডীমণ্ডপে লোকজনের জটলা। তাহারা ঘন ঘন তামাক খাইতেছে ও নানাবিষয়ে গল্পগুজব করিতেছে। বিশ্বাস-মহাশয়ের এক দূর-সম্পর্কের ভাই কলিকাতায়

কোন্ গলীতে বিল-সরকারের চাকুরি করিত—কলিকাতার গল্প বিশ্বাস-মহাশয় তাহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছেন—সম্প্রতি তিনি তাহাই মুগ্ধ ও কৌতূহলী শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বলিতে ছিলেন।

পাঠশালার গুরু নিতাই সামন্ত আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ঐ যে গরুর গাড়ি ফিরেছে—বাঁশ-ঝাড়ের আগালে পড়ে' জুলির পথটা বুজে গিয়েছে কিনা, তাই ঘুরে আসছে বোধহয়।

সকলেই গরুর গাড়িটা দেখিল, কিন্তু কেহই বিশ্বাস করিল না যে, পাত্র আসিতেছে। গরুর গাড়িটা ঘুরিয়া পিছনের পথ দিয়া আসিতেছিল, কেহই দেখিতে পাইল না ছই'-এর মধ্যে লোক বসিয়া আছে কিনা।

মিনিট পাঁচ ছয় পরে। কলেজের ছেলেটি আসিয়া মাদুরে বসিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। ছেলেটির বয়স তেইশ চব্বিশ কি এক-আধবছর বেশী, রং ফরসা, গায়ে মট্‌কার পাঞ্জাবি ও চাদর, চোখে চশমা। সে বৃদ্ধ বিশ্বাস-মহাশয়ের কাছে প্রথম ট্রেনটা ফেল হইবার গল্প করিতেছিল। সবাই হাঁ করিয়া শুনিতেছিল।

প্রথমে যদু জড়ের কীর্তনগান শুরু হইল। তারপরে দুলাল মুখুয্যে শ্যামাবিষয়ে গাহিলেন। একজন বেহালা বাজাইল। তারপরেই রিজিয়া ও বক্তিয়ার।

গ্রামের সাতকড়ি মুখুয্যে এইবার তাঁর ছেলে তিনটিকে সঙ্গে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিলেন। সাতকড়ি লেখাপড়া আদৌ জানেন না, গোলার ধানে সম্বৎসর চলিয়া যায়—সুতরাং চাকুরির ধারও ধারেন না, কিন্তু তাঁর ঝোঁক গান বাজনার দিকে। পাঁচটি ছেলের একটিকেও লেখাপড়া শেখান নাই, গান-বাজনা শিখাইয়াছেন, এবং যে-সব গ্রাম্যমজলিসে অন্য গ্রাম হইতে দু'পাঁচজন বাহিরের লোক আমদানী হয়, সে-সব স্থানে ছেলে কয়েকটিকে সঙ্গে লইয়া একখানা কম দামী বেহালা হাতে সাতকড়ি গিয়া হাজির হন।

ইনি আসন গ্রহণ করিয়াই সেজ ছেলে বসন্তকে বলিলেন—বাবা, রজনের থলিটা আনতে ভুল হয়ে গিয়েছে—একবার দৌড়ে যাও তো বাড়ি—চালির মুড়োয় তোলা আছে।

বসন্ত অপ্রসন্ন মুখে পৈঠা দিয়া নামিয়া গেল। অন্য সময় হইলে সে বাবাকে দু'কথা শুনাইত—কিন্তু নবাগত শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকের সম্মুখে তাহার সাহসে কুলাইল না।

—গেন্টু (বসন্তের ডাক নাম) আজকাল যা কীর্তন গায়, চমৎকার। রাসু অধিকারীর গাওনা তো শুনেছি ঘেঁটুপাছির বারোয়ারীতে—তার চেয়ে কম নয়। আমার ছেলে বলে, বলছি নে পদ্ম খুড়ো, তা নয়। রজনটা ফেলে এসে মুশকিল হোল কিনা।...শোনাচ্ছি একখানা, আসুক।

পদ্মলোচন চক্রবর্তী গ্রামের পুরোহিত—তিনি গান-বাজনা বিশেষ বোঝেন না, তবুও সাতকড়িকে খুশী করবার জন্য বলিলেন—আহা হীরের টুক্‌রো ছেলে তোমার বসন্ত। ওর গলা আর শুনিনি আমি?...কোজাগরী পূজোর দিনে মহিমদা'র বাড়িতে গাইলে—আহা, যেমনি গলা তেমনি তাল-বোধ।

সাতকড়ি ছেলে তিনটিকে চারিধারে বসাইয়া নিজে মধ্যে বসিলেন। ইতিমধ্যে রজন্ আসিয়াছিল, গান শুরু হইল।

—আর একটু ধরে ধর বাবা

বলিয়া সাতকড়ি গর্বিত হাসিমুখে ও প্রশংসমান দৃষ্টিতে কীর্তনগানরত পুত্রের দিকে একবার চাহিয়া আবার চারিধারে চাহিতে লাগিলেন। গান একে একে অনেকগুলি হইল। সাতকড়ি বড় ছেলেকে একবার ফরমায়েশ করিয়া বলেন—মানু, গা তো সেই "ওগো শ্যাম গুণমণি ?"...বড় ছেলের শেষ হইলে আবার সেজ ছেলেকে ফরমায়েশ করিতেছিলেন—ধর দিকি বাবা "মম মানস শুক পাখি ?" অনেকদিন শুনিনি তোর মুখে। কৈলেস খুড়ো, একটু ঠেকা দিয়ে যাও না, ভাল গানখানা···

সাতকড়ি ছেলেদের লইয়া আসিবার পরে আসরে আর কেহ আমল পান নাই। সাতকড়ি নিজের ছেলেদের নিজে বাহবা দিয়া, হাসিয়া, চোখ বুজাইয়া ঘাড় দোলাইয়া, ফরমায়েশ করিয়া এমন জমাইয়া তুলিলেন যে আর কাহারও আমল পাইবার যো ছিল না।

খানিকটা পরে আগন্তুক শহরে-ছেলেটি কি কথায় কথায় কলেজের গল্প তুলিল। সে নূতন কলেজে ভর্তি হইয়াছে, বয়স অল্প, দেখিতে সুশ্রী। এ ধরনের অজ পাড়াগাঁয়ের লোকজনের মাঝখানে কথা বলিয়াও সুখ আছে। তাহার ইংরাজী বুকনি-মিশানো কথাবার্তায় সাতকড়ি ভয় খাইয়া গেলেন। ছেলেটি বলিতেছিল—এ সব পাড়াগাঁয়ে সে-সব কেই বা বোঝে ?...এডুকেশন না থাকলে কি একটা জাত কখনো উঠতে পারে ?..কলেজে আজকাল মেয়েরা পড়ছে—এম্-এ, বি-এ পর্যন্ত পাস করছে—সে-সব দিন কি আর আছে ?···দেখে আসুন একবার কলকাতায় গিয়ে।

মেয়েদের এত লেখাপড়ার কথা এ-গ্রামে কেহ শোনে নাই। কৈলাস ভট্টাচার্য বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—মেয়েরা এম্-এ, বি-এ পাস দিচ্ছে ? বলো কি বাবাজী! কই এ-কথা শুনিনি তো ?···

—এ পাড়াগাঁয়ে বসে' শুনবেন কোথা থেকে ? ছেলেরা যেখানে কখনো স্কুলের মুখ দেখেনি, সেখানে মেয়েদের লেখাপড়ার কথা তো ভাবতেই পারবেন না।

ও-দিকে সাতকড়ি মুখুয্যে একটু অপ্রতিভ হইলেন। শুধু অপ্রতিভ নয়, কোথায় যেন তিনি নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিলেন। পাঁচ পাঁচটি ছেলের কোনোটিকেই তিনি লেখাপড়া শেখানোর কোনো চেষ্টা করেন নাই—গান-বাজনা শিখিলে ভদ্রসমাজে, মজলিসে সর্বত্র সম্মান ও গৌরবলাভ করা যাইবে—এতদিন তিনি ইহাই জানিয়া আসিয়াছেন, ছেলেগুলিকে সেই অনুসারেই মানুষ করিয়াছেন। কুলবেড়ের বাহিরে বড় জগৎটাতে যে অন্য ধরনের হিসাব-নিকাশ প্রচলিত, তাহাদের খোঁজও তিনি জানিতেন না।

তিনি নিঃশব্দে তাঁর বেকালাখানা খেরোর খাপের মধ্যে পুরিলেন, রঙ্গনের থলিটা সবার অলক্ষ্যে বড় ছেলের হাতে তুলিয়া দিলেন।

একটু পরে জলযোগের ডাক পড়িল।

ইহাও কেবল মাত্র ভাবী পাত্রের জন্য নহে, গ্রামস্থ সকল নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের জন্য। ছেলেটি এই প্রথম পাত্রীর বাড়ি দেখিল। দেখিয়া একটু নিরাশ হইল। চার পাঁচখানি

খড়ের বড় বড় ঘর, সামনের উঠানে বড় বড় গোটাকতক গোলা, দক্ষিণে একটা পুকুর, একটা বাতাবীলেবু গাছ ও গোটাকতক নারিকেল গাছ। পাত্রীর দিদিমা বাড়ির কর্ত্রী; তিনিই গ্রামসুদ্ধ সকলকে আদর করিয়া বসাইলেন, জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন।

ক্রমে বেলা চড়িয়া গেল। মধ্যাহ্ন ভোজন মিটিতে দুইটা বাজিল। ছেলেটি একটু অবাক হইল, ইহাদের ভোজনের পরিমাণ দেখিয়া। একটি পনেরো বছরের বালকও যাহা খাইল, তাহা তার নিজের তিন বেলার খোরাক।

বেলা যখন পাঁচটা, তখন কৈলাস ভট্চায আসিয়া বলিলেন—বাবাজী, ওঠো একবার মেয়েটিকে ছাখো। বাবাজীই বলি, তোমার সঙ্গে তো সম্পর্কই বাধলো। মেয়ে দেখে অপছন্দ হবে না। তবে এ তো শহর বাজার নয়, একটু আধটু যা ত্রুটি, তা তোমাকে শুধ্‌রে নিতে হবে বৈকি। এসো বাবাজী।

আবার চাটুয্যে-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক জড়ো হইয়াছে। গতিক দেখিয়া মনে হয়, অন্তকার মত একটা উৎসবের ব্যাপার ইহাদের গ্রামে অনেককাল ঘটে নাই। অন্ততঃ আগন্তুক ছেলেটির তাহাই মনে হইল; নতুবা গৃহস্থ-বাটীতে মেয়ে-দেখানো-রূপ সামান্ত ব্যাপারে গ্রামসুদ্ধ লোকের এত উৎসাহ কেন?

মেয়ে দেখিয়া ছেলেটি সন্তুষ্ট হইল। বেশ স্বাস্থ্যবতী, রং খুব ফরসা না হইলেও মানান্‌সই—মুখশ্রী সুন্দর, বড় বড় চোখ। কেবল ইহাদের চুল বাঁধিবার ধরন সে পছন্দ করিল না। পাতা-কাটা খোঁপা শহর হইতে কোন্ কালে উঠিয়া গিয়াছে, আর ইহারা সেটাকে এখনও ফ্যাসান্ বিবেচনা করে! তা ছাড়া অত গহনা কেন গায়ে? গহনার ভারে মেয়েটি যেন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

দিদিমা সজল চোখে বলিলেন—ওকে নাও গিয়ে দাদাভাই। ও আমার যেমন মেয়ে, তেমন মেয়ে এদিকে নেই, এ আমি বড় গলা করে' বলতে পারি। ওরা আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে' গেল, মেয়ে তখন তিন মাসের—সেই থেকে আমার কাছে মানুষ। আমারও তো ও-ছাড়া আর কেউ নেই, ওর বাবা কোনো খোঁজ নেয় না; সে আবার বিয়ে করেছে ছেলেপুলেও হয়েছে, সে এ-দিক-মাড়ায় না। তোমার হাতে মেয়েটাকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হই—তারপর যা রইলো সবই তোমাদের। কর্তারা যা করে রেখে গিয়েছেন, তাতে চাকরি করে' খেতে হবে না, আমাদের বাড়িতে চাকরি কখনো কেউ করে নি।

কৈলাস ভট্চায বলিলেন—এ-গাঁয়ে কখনও কেউ চাকরি করেছে বউ-ঠাকরুণ? আপনাদের কর্তাদের কথা তো বাদই দিন, তাঁরা তো ছিলেন গাঁয়ের মালিক, মাথার মণি—আমাদের কর্তারা, কি আমরা কখনো গাঁয়ের বাইরে অন্নের চেষ্টায় পা বাড়িয়েছি? রামোঃ। এই যে দেখছো বাবাজী উত্তরে মাঠ এ সব লাখ্‌রাজ, একেবারে সেই রতনপুরের নীলকুঠি পর্যন্ত। তবে এদের বাড়িতে পুরুষ মানুষ নেই, একা বউ-ঠাকরুণ আছেন, মেয়েমানুষ—তাই চাষ বাস হয় না। নইলে বাট সত্তর বিঘে খাসে আমন ধানের জমি রয়েছে, দুটো বড় পুকুর রয়েছে—চাষ করলে ভাবনা কিসের? এই দেখছো বটে খড়ের ঘর, এ গাঁয়ে সকলেই এঁদের প্রজা।

ছেলেটির নাম সুরেন। আহারাদির পরে সে বাড়ির চারিধারে ঘুরিয়া দেখিল। কলিকাতায় থাকিবার আজকাল বড় কষ্ট, পড়াশুনা শেষ করিয়া চাকুরির বাজারও সুবিধা নহে—যদি এখানে বিবাহ করিয়া সম্পত্তি পাইয়া বাস করা যায়, এ পল্লীগ্রামের শান্তি ও নির্জনতার মধ্যে শহরের উগ্র জীবন-সংগ্রাম হইতে বেশদূরে, নিশ্চিন্তভাবে চমৎকার জীবন কাটিবে এখন।

সুরেন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, এ জমিটা পড়ে' আছে কেন ভট্‌চায্যি মশায়।

—ওই যে তোমাদের বল্‌লাম বাবাজী, এদের বাড়িতে চাষ করবার মানুষ কই? বুড়ী একা তো সব দিক্ দেখতে পারে না। তোমার সঙ্গে যদি বিধাতা যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন, তবে তুমিই এসে সব নিজের হাতে নাও না? তোমায় তা হোলে কি কারুর চাকরি করতে হবে! পায়ের ওপর পা দিয়ে চাটুয্যেদের সাত পুরুষ এই ভিটেতে দুধ-ঘি খেয়ে কাটিয়ে গিয়েছে, তোমারও কাট্‌বে।

সুরেন নিজের মেসের কথা ভাবিতেছিল। জানালাহীন ছোট্ট ঘরটার কথা ভাবিল—হাওয়া কোনো কালে খেলে না, গরমে অর্ধেক দিন রাত্রে ঘুম হয় না। এতটুকু এক টুক্‌রা মাছ, বিস্বাদ ডাল, ততোধিক বিস্বাদ তরকারী—একদল লোক খাইয়া উঠিয়া গেলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভাল করিয়া না ধুইয়াই তাহার উপর আর একদল লোক খাইতে বসিয়া যায়, দেওয়ালের গায়ে আরসুলা চলাচল করে—সব কথা ভাবিয়া দেখিল।

এখানে এই মুক্ত মাঠের ধারে স্বাধীন জীবন—নিজের লোকজন, নিজের হুকুমমত সকলকে খাটানো। সে দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, এ-সব তো তাহার কাছে স্বর্গের মতই নাগালের বাহিরের জিনিস।

মন্দ কি? আইন পাস করিয়া কি হইবে? এই তো বেশ।

মহা উৎসাহে সে ভট্‌চায্যি-মশায়কে বিষয়-আশয় সংক্রান্ত আরও প্রশ্ন করিতে লাগিল। কলমের বাগানগুলা কোন্ দিকে? প্রত্যেকটাতে কতগুলা করিয়া গাছ? পুকুরগুলা কি মাছ ছাড়িবার উপযুক্ত আছে?

বেলা খুব পড়িয়া আসিয়াছিল। নিকটের বিলের ধার হইতে চরিয়া গরুর দল কর্দমাক্ত গায়ে বাড়ি ফিরিতেছিল। সান্ধ্য হাওয়ায় তালগাছে বাবুই পাখীর বাসা দুলিতেছে ও শুক্‌না তালপাতায় খড়্‌-মড়্‌ শব্দ হইতেছে।

সুরেন একা একটু বেড়াইবার জন্য দক্ষিণের মাঠের রাস্তাটা ধরিল। কৈলাস ভট্‌চায এবার সঙ্গে আসেন এটা সে চায় না; কিন্তু ভট্টাচার্য মশায় খোশগল্পের শ্রোতাকে অত সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

—শুভ রত্নপুরের খড়ের মাঠটার শালিয়ানা তিনশো টাকা আয় ছিল বাবাজী। বাঁড়ুয্যে-গিন্নি তো বোঝেন না, ওঁকে ঠকিয়ে সেটা বারো ভূতে খাচ্ছে। তুমি দেখে শুনে খাসে আদায় করবে, শিখিয়ে দিলাম তোমায়!

সন্ধ্যার পরে আবার অনেকে চণ্ডীমণ্ডপে জড় হইল।

সুরেন এবার যেন এখানকার এই সকল আনন্দস্রোতে নিজেও ভাসিয়া গেল। সাতকড়ির বেহালা দু'তিনবার ফরমাইশ করিয়া শুনিল, তাঁর ছেলের কীর্তনের তারিফ্ করিল।

সাতকড়ি বলিল—গাঁয়ের সব ছেলেরা আমায় ধরেছে, তোমায় বলতে সাহস করে না, বাবাজী, এবার ওরা একটা শখের দল খুলছে, তোমায় কিছু চাঁদা দিতে হবে।

তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি লোক হাসিমুখে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া হাত তুলিয়া সকলকে নমস্কার করিল।

সাতকড়ি বলিলেন—এসো মাস্টার বসো। স্কুল ছেড়ে দিয়ে এলে? সুরেন বাবাজী, এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই, ইনি পাশের গাঁয়ে স্কুল খুলেছেন; খুব ভালো মাস্টার, নিভাননীকে ইনি একবেলা ইংরাজী পড়ান।

মাস্টার সুরেনের দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। তাহাকে দেখিয়া সুরেনের মনে বিশেষ ভক্তির উদ্রেক হইল না। এমন তেল মাখিয়াছে যে কানের পাশ গড়াইয়া পড়িতেছে, মুখ পানে লাল, বোকার মত হাসিটা। হাঁ, ইংরাজীর অধ্যাপক বটে! ভাবী পত্নীর ইংরাজী শিক্ষাটা হইতেছে ভালোই। মাস্টার জুটিয়াছে যখন এমন!

মাস্টার বসিয়া বসিয়া বক্‌বক্ করিতেছিল। নিজের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ কে ছাড়ে? কি করিয়া নিভাননীকে অক্ষর চিনাইল কি করিয়া এ-বি-সি লিখিতে শিখাইল সেই সব বলিল। মাস্টারের কথা শুনিয়া সুরেনের মনে হইল—ফার্স্টবুকের ঘোড়ার গল্প তার ইংরেজী-ভাষাজ্ঞান-রূপ সৌধের সর্বোচ্চ। অতএব ছাত্রীর বিদ্যা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু কি করিবে সে! এই দূর পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়েকেই জীবন-সঙ্গিনী করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। মেসের দেনা মিটাইতে না পারিলে আগামী মাসে ছাড়িতে হইবে—চারিধারে বন্ধুবান্ধব-মহলে দেনা, দেনা। কলিকাতায় আর কতদিন টিকিয়া থাকা চলিবে?

ভাগ্যে, সে এই মেয়েটির বাপের এক বন্ধুর নিকট হইতে মেয়ের সন্ধান পাইয়াছিল! তিনিও তাহার মেসেই থাকেন। তাঁহার চিঠি লইয়াই সে এখানে আসিয়াছে মেয়ে দেখিতে। পাল্‌টি ঘর, দেখিতে সুশ্রী, কলেজে পড়াশুনা করিতেছে—ইহাদেরও আপত্তি হইবার কথা নয়।

কিন্তু একটা গোলমাল আছে।

সে-কথা এখনও পর্যন্ত সে কাহাকেও বলে নাই, কারণ কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। সে অতি দরিদ্র, তাহার নিজেদের ঘর বাড়ি পর্যন্ত নাই, তাহার বাবা চিরকাল শ্বশুরালয়ে বাস করেন, সেকালের ঘর-জামাই। ইঁহাদের কথাবার্তায় সে বুঝিতেছে, যে শিক্ষিত ও শহুরে পাত্রের হাতে মেয়ে দিলে মেয়ে শহর-বাজারে বাসায় থাকিবে, গাড়ি-ঘোড়া চড়িবে, গহনা-গাঁটি পরিবে—ইহা মেয়ের দিদিমার একটা সাধ এবং সম্ভবতঃ মেয়েরও।

কিন্তু তাহার দ্বারা কোনো সাধই যে পূর্ণ হইবার নহে, সেই কথা খুলিয়া বলা হয় নাই। সে বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে কাপড় জামা, চশমা ধার করিয়া আনিয়াছে বলিয়া ও চেহারাটা সুশ্রী বলিয়া উহাদের পক্ষে ধরিয়া লওয়া স্বাভাবিক যে সে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলে। ইহারা সন্ধান করিয়াও আসল ব্যাপার বাহির করিতে পারিত না; কারণ তাহার মামারা সত্যই অবস্থাপন্ন। তাহার পিতামাতা ও ভাইবোনের সে-বাড়িতে স্থান যে বাড়ির চাকর-বাকরের চেয়েও নিচু, তাহা ইহারা বাহির হইতে বুঝিতে পারিবে কি—বিশেষতঃ, এই ধরনের সরল প্রকৃতির লোক এরা!

নানা দিক ভাবিয়া সে এখানে আসিয়াছিল। মেসের ভদ্রলোকটির মুখে সে সবই শুনিয়াছে। মেয়ে-জামাই এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী দাঁড়াইবে, সত্য বটে। সে এখন নয়, বৃদ্ধার মৃত্যুর পরে যদিও—তবুও সারাজীবনের অন্নসমস্যার মীমাংসা বিবাহের সঙ্গেই হইয়া যাইবে।

কিন্তু সে যদি অবস্থা গোপন করিয়া বিষয়ের লোভে এখানে বিবাহ করে, যদি সে কাহাকেও কিছু না ভাঙে, হয়তো ইহারা কোনো অনুসন্ধান করিবে না তাহার বিষয়, হয়তো বিবাহ হইয়া যাইবে। কিন্তু সে কাজের পরিণাম ভালো নয়। ইহার পর স্ত্রী পর্যন্ত তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবে।

রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিল। নবীন পল্লীপ্রকৃতি একটি রহস্যাবৃত সৌন্দর্যের কুয়াশায় নিজেকে আবৃত করিয়াছে। সারা রাত সে ঘুমাইতে পারিল না।

অত্যন্ত সহজেই এ বাড়ি এই গ্রামের মাঠ, বন, তাহার আপনার হইতে পারে।

কি করিবে সে?···

পরদিন সকালে উঠিয়া সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু সেদিন সকালে কৈলাস ভট্চায তাহাকে নিজের বাড়িতে যাইতে বলিয়াছিলেন—সুরেনের আপত্তি তিনি শুনিলেন না। বলিলেন—বাবাজী, ভারী তো খাওয়াবো, দুটো মাছের ঝোল ভাত—তার জন্যে কি তোমার ট্রেন ফেল্ করাবো আমি! সব সকাল সকাল হয়ে যাবে এখন। গাড়ি ধরিয়ে দেবার ভার আমার ওপর। তুমি এখন থেকে আপনার জন হতে চললে, দুটো না খাইয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি?

খাওয়ার আয়োজন সকাল সকালই হইল। দুধ, মাছ, দই সব চাটুয্যে-বাড়ি হইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহাদেরই পুকুরে শেষরাত্রে মাছের জন্য জাল ফেলা হইয়াছিল। চাটুয্যে-গিন্নীও উপস্থিত ছিলেন, কাছে বসিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। ছেলেটিকে সত্যই তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। দেখিতে সুশ্রী, বুদ্ধিমান, অমায়িক—লেখাপড়া জানা তো বটেই। নিভাননীর অদৃষ্টে এখন এমন বর জুটিলে তো! তেমন কপাল কি সে করিয়াছে!

গরুর গাড়িতে উঠিবার সময়ে তিনি পথে খাইবার জন্যে গাড়িতে ডাব, পেঁপে ও আম তুলিয়া দিলেন। বাড়ির একজন চাকর সুরেনকে জিনিসপত্র সমেত ট্রেনে তুলিয়া দিতে যাইবে, ঠিক হইল।

চাটুয্যে-গিন্নী সুরেনের হাতদুটি ধরিয়া বলিলেন—দাদাভাই, এ কাজ যাতে বোশেখ মাসের মধ্যে হয় তা তোমাকে করতেই হবে। নিভাননীকে তোমার নিতেই হবে। দেখে শুনে তো সবই গেলে, তোমার বাবাকে গিয়ে পাঠিয়ে দিও, এসে মেয়ে আশীর্বাদ যেন করে' যান। আমার কথা দিয়ে যাও, যে এতে তোমার অমত নেই। গিয়েই পত্তর দিও দাদা···

সুরেন চলিয়া গেলে দিন কতক গ্রামে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা চলিল এবং সাওকড়ি ছাড়া অন্য সবাই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করিয়াছে। কৈলাস ভট্চায তো সকলের কাছে তাহার শতমুখে প্রশংসা করিয়া বেড়াইলেন।

একদিন করিয়া সপ্তাহ খানেক কাটিয়া গেল। সুরেনের কোনো পত্র বা সংবাদ কিছুই আসিল না। চাটুয্যে-গিন্নী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে দিন বারো কাটিল। কোনো খবর নাই। চাটুয্যে-গিন্নী সুরেনের ঠিকানায় কৈলাস ভট্চাযকে দিয়া লিখাইয়া রেজেস্ট্রী পত্র দিলেন।

আরও দিন কতক কাটিল, সে-পত্রের কোনো জবাব আসিল না।

চাটুয্যে-গিন্নী কৈলাস ভট্চাযের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। কৈলাসের নিজের বড় ছেলে রাম, পাশের গ্রামের নবীন কাপালির সঙ্গে দিনকতক ভাগে কাঁঠালের ব্যবসা করিয়াছিল; বার তিনেক কাঁঠালের চালান লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল; সুতরাং তাহাকেই সুরেনের বাসার ঠিকানা দিয়া কলিকাতা পাঠান হইল।

তিন দিন পরে রাম ফিরিল। কলিকাতার মেসের সেই বাবুটি একখানা পত্র দিয়াছেন, সেখানা সে বাবার হাতে দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কৈলাস পত্রখানা খুলিয়া পড়িলেন। সুরেন বাঁচিয়া নাই। এখান হইতে ফিরিয়া দিন-কতক পরে সে নিজের দেশে অর্থাৎ মামার বাড়িতে যায় পিতার সঙ্গে সব কথা খুলিয়া বলিতে, সেখানে কলেরা হইয়া মারা গিয়াছে।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না। পরের শ্রাবণেই নিভাননীর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। পাড়ার বড় চণ্ডীমণ্ডপটাতে আবার বিস্তৃত বরাসন পাতা হইয়াছে। দুপুরের পর হইতে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েরা জড় হইয়া ভিড় করিতেছে। গ্রাম-সুদ্ধ সবারই আজ চাটুয্যে-বাড়ি নিমন্ত্রণ—সুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাড়াটুকু যে তাহা নয়, শূদ্রভদ্র সবারই। কৈলাস ভট্চায ব্যস্ত আছেন; কারণ চাটুয্যেদের পুকুরে সব ছোট মাছ বলিয়া মহিমপুরের নিকারীদের মাছের বায়না দেওয়া হয়েছে, মাছ এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই।

বৈকালে বরের দল আসিল। বরের বাড়ি এদিকেই, গোটাদুই স্টেশন পরেই। ইহাদের আনিতে বরের পাল্কী বাদে খান পাঁচছয় গরুর গাড়িও স্টেশনে গিয়াছিল। বরযাত্রীদের মধ্যে বৃদ্ধের দলই বেশী, দুই একটি বালকও আছে।

মেয়েরা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পথের ধারে বরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মেটে হাঁড়ীর ভিতর দৃষ্টি-প্রদীপ লইয়া কৈলাস ভট্চাযের স্ত্রী অপেক্ষা করিতেছিলেন। চাটুয্যে-গিন্নী একটু পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন।

বরের পাল্কী পাকুড় তলায় নামাইল।

বর পাল্কী হইতে বাহির হইল। বরকে এ-পর্যন্ত এখানকার কেহ দেখে নাই, বরের জ্যাঠামশাই আসিয়া সব ঠিকঠাক করিয়া গিয়াছিলেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে, দোজপক্ষে বিবাহ করিতেছে, এবং খুব ফরসা না হইলেও কালো নয়, বেশ স্বাস্থ্য, মাথায় সামনের দিকে একটা ছোট টাক।···

চাটুয্যে-গিন্নী অনেকক্ষণ হইতে একদৃষ্টে পাল্কীর দিকে চাহিয়াছিলেন! ঝি-বউরা উলু দিয়া কলরব করিয়া উঠিলে তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি তো জানিতেন সুরেন আসিতেছে না, আসিতে পারে না—তবুও পাল্কী হইতে সুরেনের পরিবর্তে ইহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি নিরাশ হইলেন কেন—কে জানে।